• তিনটি ভিন্ন স্বাদের ধারাবাহিক
• গল্প • ভ্রমণ • বিশেষ রচনা

সাপ্তাহিক বর্তমান

১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ • দাম ১০ টাকা

মৃত্যুর আগে মানুষ কী কী অনুভব করে?

• জন্ম রহস্য • মুক্তি কী?
• মৃত্যুর আগে কী কী ঘটে?
• মৃত্যু আগাম বুঝতে পারে কারা?

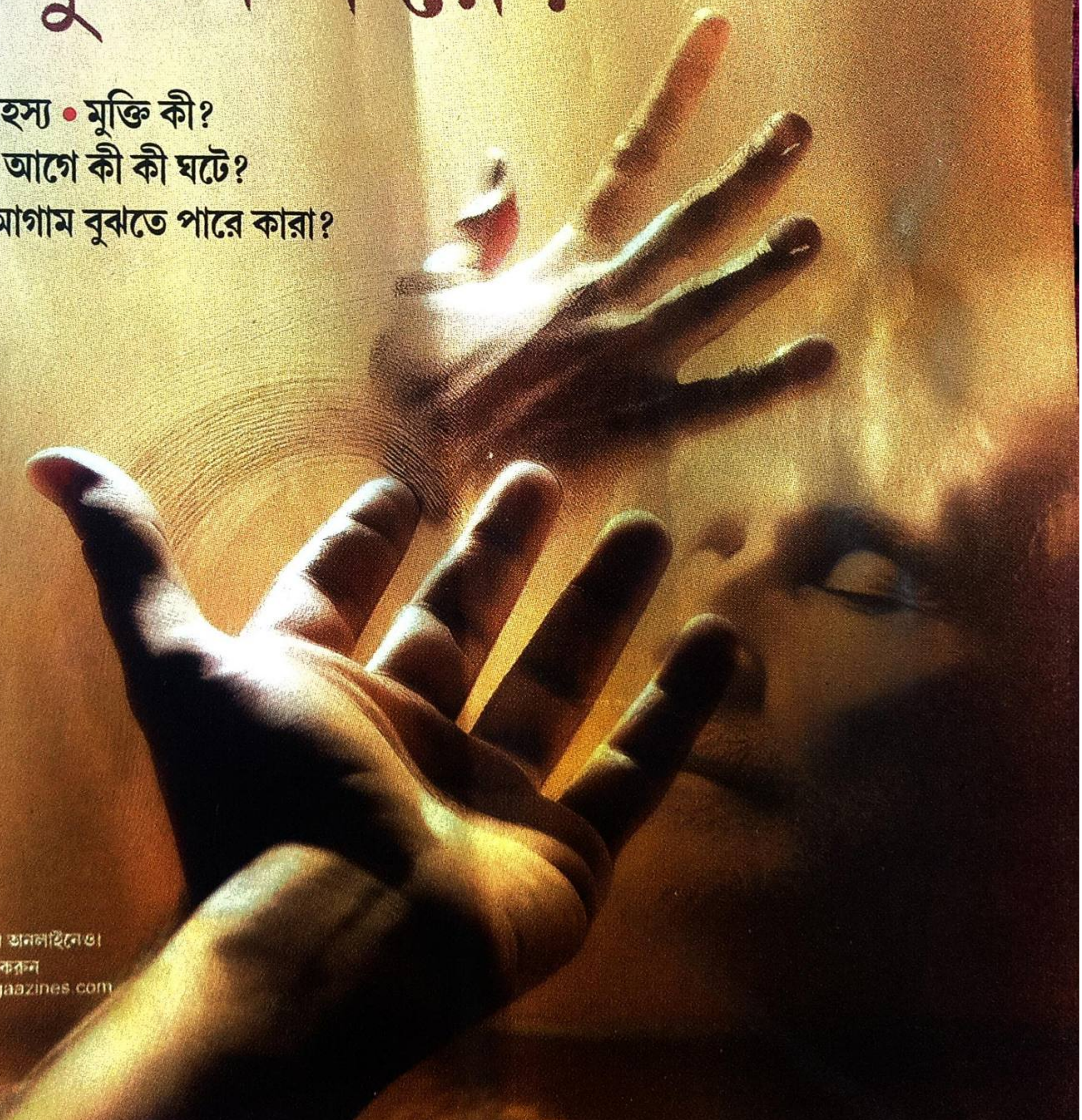

সাপ্তাহিক বর্তমান এখন অনলাইনেও।
বিশদ জানতে লগ অন করুন
www.bartamanmagaazines.com

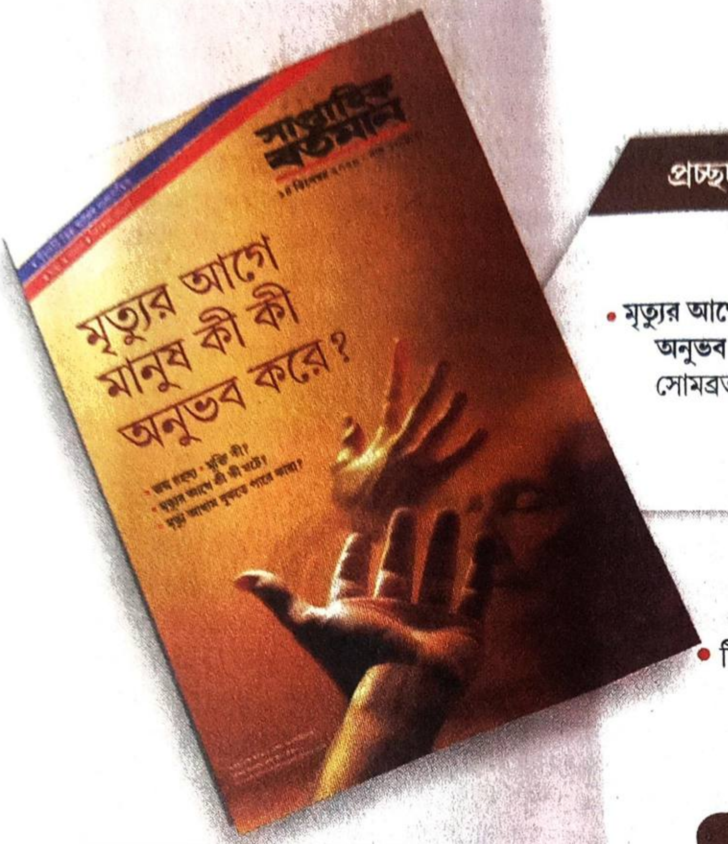

সাপ্তাহিক বর্তমান

সূচিপত্র

বর্ষ ৩৭ • সংখ্যা ৩১
১৪ ডিসেম্বর ২০২৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

• মৃত্যুর আগে মানুষ কী কী অনুভব করে? ৮
সোমব্রত সরকার

ধারাবাহিক

• আমি ও আমি ২১
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
• টিমোথি ও আখতার গোঁসাই ৩৮
দেবতোষ দাশ
• বিষ্ণুলোকে সন্ধ্যা নামে ৪৭
হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

বিশেষ রচনা

• বাঙালির সেই গৃহ সহায়করা ২৬
সুরজিৎ ধর
• এক বিপন্ন জার্নালের ইতিকথা ৪৩
রূপক মিশ্র

সিনেমা ও টিভি

• রাজ কাপুর ৬০
• আনন্দীর ফ্রোরে আদর্শের আনন্দগান ৬৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠি ২ অমৃতকথা ৩ শব্দ ৪
বইপাড়া ৫ সুখে থাকুন ৪২ সাম্প্রতিক ৫৩
স্বাস্থ্য ৫৪ সংস্কৃতি ৫৮ ভাগ্যচক্র ৬৪

গল্প

• ব্যুমেরাং ২৯
সিদ্ধার্থ নাহা

খেলা

• খেতাব জিতে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু সিন্ধুর ৫৬
• গুয়ার্দিওলাই হলেন ফুটবলের চে গেভারা ৫৭

ভ্রমণ

• পাহাড়িয়া পাঁচমারি ৩২
অর্পণ রায়চৌধুরী

প্রধান সম্পাদক : হিমাংশু সিংহ
সম্পাদক : তাপসী দাস
সহকারী : ছন্দবাণী মুখোপাধ্যায়, গুঞ্জন ঘোষ, অয়নকুমার দত্ত ও অনির্বাণ রক্ষিত
শিল্প বিভাগ : সোমনাথ পাল, সুব্রত মাজী ও চন্দন পাল
প্রচ্ছদ : সোমনাথ পাল

Editor: Tapasi Das
Printed and Published by Jibananda Basu on behalf of
Bartaman Private Limited
6 J.B.S Haldane Avenue, Kolkata-700105
Ph-2251 3292/93
RNI NO.48049/88
14 December 2024. 37 Years. 31 Issue

• চিঠি

সুন্দরবনের মধু ও মৌলে

সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় ২৮ আগস্ট ২০২৪ সংখ্যায় 'সুন্দরবনের মধু ও মৌলে' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়ে বিশদে অনেক কিছু জানতে পারলাম। সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাঁরা যান তাঁদের এবং পরিবারের অন্যান্যদের দশ-পনেরো দিন নানা বাধ্যবাধকতা ও নিয়ম পালন করতে হয়। এই প্রসঙ্গে আমার সংযোজন, সুন্দরবনে সাধারণত এপ্রিল থেকে জুন মাসে মধু সংগ্রহকারীরা বনে যান। কারণ এর আগে বনে যাওয়ার অনুমতি মেলে না। এঁরা একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে জঙ্গলে মধু সংগ্রহে যান। এঁদের সঙ্গে সবসময় একজন দক্ষ দলনেতা থাকেন। যিনি খুব অভিজ্ঞ। সকল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মধু সংগ্রহকারীরা নৌকা, বাসন, চাল, সব্জি ইত্যাদি নিয়ে যাত্রা করেন। এর আগে দেবী বনবিবির কাছে প্রার্থনা করেন। কারণ ১০-১৫ দিনের মতো বাড়ির বাইরে থাকতে হয় পরিবার ছেড়ে। ছেলেমেয়েরা যাতে নিরাপদে থাকে সেজন্য তাঁরা বনদেবীকে স্মরণ করেন। বাড়ির মেয়েরাও অনেক কিছু নিয়ম পালন করেন, যাতে জঙ্গলে কোনও বিপদে আপনজনটি না পড়েন। মধু সংগ্রহ ভ্রমণের সময় একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া বা মিথ্যা কথা বলেন না বা অন্যের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন না। সঙ্ঘবদ্ধভাবে চলে মধু সংগ্রহ অভিযান।

প্রতি পদক্ষেপে প্রত্যেককে সব সময় খুব সতর্ক থাকতে হয়, কারণ বাঘ বা কুমির যেকোনও সময় আক্রমণ করতে পারে। মধু সংগ্রহকারীরা অনেক সময় মাথার পিছনে মুখোশ পরেন, কারণ ধূর্ত বাঘ মনে করে মানুষ তাকে লক্ষ করছে!

কখনও কখনও বাঘের আক্রমণের ভয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ মধু সংগ্রহের আগে অল্প মধু নিয়ে ফিরে আসতে হয়। সেক্ষেত্রে সংগ্রহ মাত্রার পরিমাণ অনেকটাই কমে যায়।

নদীর ধারে নৌকা নোঙর করার পর দু'টি দল দু'দিকে ভাগ হয়ে মৌচাকের সন্ধানে গভীর বনে প্রবেশ করে। মধু সংগ্রহের সময় তাঁদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী মৌমাছির গতিবিধি লক্ষ করেন। মধু বোঝাই মৌমাছি তুলনামূলকভাবে ধীরে ধীরে ওড়ে ও ডান এবং বাঁদিকে চলার পরিবর্তে সোজা চলে। মৌমাছির সন্ধানের সময় চোখ থাকে উপরের দিকের গাছগুলিতে এবং মৌচাক খুঁজে পাওয়ার পর, ধোঁয়া তৈরির জন্য সবুজ পাতা দিয়ে তোড়ার মতো একটি ঝাড়ু তৈরি করা হয়। মৌমাছির কামড় থেকে রক্ষা পেতে সবাই সেই সময় কাপড় বা মাস্ক দিয়ে মুখ ঢেকে রাখেন। অভিজ্ঞ দলের সদস্যরা মৌচাকে শুধুমাত্র সেই অংশ কেটে ফেলেন যাতে মধু থাকে। সম্পূর্ণ মধুর চিরুনি ধ্বংস করা দলের অভ্যাস নয়, কারণ এটিকে পবিত্র বনের ক্ষতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সংগ্রহ করা মধু স্টেইনলেস স্টিলের ক্যানের ভিতরে রাখা হয়। যা আকৃতিতে সমতল হয় যাতে আর্দ্রতা কম হয় এবং মধু ঘন এবং আঠালো হয় না। এভাবে প্রতি পদে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সুন্দরবনের মধু সংগ্রহকারীরা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। ভাগ্য ভালো থাকলে সবাই একসঙ্গে ফেরেন। তখন বাড়ি থেকে নিয়ে আসা মানত করা মুরগি বনবিবির বাহন বাঘকে খুশি করতে জঙ্গলে ছেড়ে আসেন মধু সংগ্রহকারীরা।

বনের ভেতরে বাঘ বা বন্যপ্রাণীর হামলায় কোনও মৌলে মারা গেলে, তাঁর পরিবারকে খুব কষ্টে দিন কাটাতে হয়। এখনও এমন কুসংস্কার আছে, বাঘের আক্রমণে নিহতদের স্ত্রীরা বিয়ে করতে পারেন না। তাঁদের বাঘ বিধবা বলা হয়। জঙ্গলে প্রবেশের জন্য যাঁরা পাস না নিয়ে মধু সংগ্রহে যায় তাঁরা বেআইনি কাজ করেন। তাতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণ পাওয়া তো যায়ই না, উপরন্তু বনদপ্তরের টহলদারিতে ধরা পড়ার ভয় থাকে। সংসার চালাতে এবং রোজগারের তাগিদে প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই গরিব মানুষেরা প্রতিবছর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মধু সংগ্রহ করে চলেছেন।

উৎপল মুখোপাধ্যায়
চন্দননগর, হুগলি

সাপ্তাহিক বর্তমানে লেখা পাঠানোর নিয়ম

- সাপ্তাহিক বর্তমানে লেখা পাঠানোর সময় খামের ওপর স্পষ্ট করে 'সাপ্তাহিক বর্তমান' এবং বিভাগের নাম লিখে দেবেন।
- ডাকযোগ ছাড়া ই-মেলেও লেখা পাঠাতে পারেন।
- ই-মেলে লেখা পাঠালে অবশ্যই ইউনিকোড ওয়ার্ড ফাইল পাঠাবেন।
- যে কোনও লেখার সঙ্গে অবশ্যই ইংরেজিতে নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর দেবেন।
- লেখা পাঠানোর পর ছ'মাস অপেক্ষা করে ফোন করবেন।
- লেখা সংক্রান্ত খোঁজ নেওয়ার জন্য দপ্তরের ফোন নম্বরে ফোন করবেন। সময়: ১১টা থেকে সন্ধে ৬টা।
- লেখা (চিঠি, ব্যাখ্যা নেই ও শব্দছক বাদে) প্রকাশিত হলে সাত দিনের মধ্যে দপ্তরে যোগাযোগ করুন।
- প্রিন্ট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে এমন লেখা গ্রহণ করা হয় না।
- লেখা প্রকাশিত হলে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানাতে পারেন, তবে সেটি আংশিক।
- প্রকাশিত হওয়ার পনেরো দিন বাদে সম্পূর্ণ লেখাই পোস্ট করা যাবে।

দপ্তরের ফোন:
২২৫১ ৩২৯২/৯৩
ই মেল:
sapb1988@gmail.com
৬, জে বি এস হ্যালডেন অ্যাভিনিউ,
কলকাতা-৭০০১০৫

পত্রিকা না পেলে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

অরূপ ভট্টাচার্য (কলকাতা)
৮৪২০৪৯৯০১৫
রুদ্রপ্রসাদ কুণ্ডু (জেলা)
৯৮৫১৬৮১৭৭৯

ভিল্লতীর্থ

সুরধুনী গঙ্গার দক্ষিণ তীরে, শ্রীগিরি পর্বতের উত্তর দিকে ঋষিগণ পূজিত, সর্বকামনা সাধনকারী আদিকেশ নামে শিবলিঙ্গ রূপে বিরাজ করতেন। এই শিবের অনতিদূরেই 'সিন্ধুদীপ' নামে এক ঋষির আশ্রম ছিল। সিন্ধুদীপ ঋষির ভ্রাতার নাম বেদ। ঋষি বেদ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আদিকেশ নামধারী শিবলিঙ্গের পুজো করতেন। প্রতিদিন নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো সম্পন্ন করে মধ্যাহ্নভোজের জন্য ভিক্ষায় বের হতেন। বেদ যখন ভিক্ষায় যেতেন, সেই সময় এক ব্যাধ তাঁর ধনুকে শিকার করা মৃত হরিণ ঝুলিয়ে আদিকেশ শিব সন্নিধানে উপস্থিত হতেন। তিনিও শিবকে প্রণাম করে বেদের প্রদত্ত উপকরণগুলি পদাঘাতে সরিয়ে দিতেন। এতে শিবলিঙ্গে যে তার পা লেগে যেত তাতে কোনও ভ্রুক্ষেপও করতেন না। কেবল তাই নয়, শিকার করার শেষে হাত-মুখ জল দিয়ে ধুয়ে ফেরার সময় মুখে করে কিছুটা জল নিয়ে আসতেন। বেদের পুজোর অর্ঘ্য পা দিয়ে সরিয়ে মুখের জল দিয়েই লিঙ্গ পরিষ্কার করতেন। তারপর শিকার করা মৃগ মাংস ছাড়িয়ে তা নিবেদন করে, 'হে শিব, আমার প্রতি প্রীত হও, আমাকে ভালোবেসো।' এই প্রার্থনা করে শিবকে নিবেদন করা মাংসই তিনি প্রসাদ রূপে গ্রহণ করতেন। ব্যাধ কিন্তু শিবের কাছে শ্রদ্ধা-ভক্তি ছাড়া আর কিছুই চাইতেন না।

ছবি : সুব্রত মাজী

ব্যাধ যদিও উচ্ছিষ্ট দিয়ে পুজো করতেন তবু শিব কিন্তু তাঁর প্রার্থনাতেই তুষ্ট হলেন। যতক্ষণ না সেই ব্যাধ বা ভিল পুজো করতে আসতেন ততক্ষণ, 'সখা কেন এল না!' এইরকম একাকী বোধ করতেন। এইভাবে অনেকদিন অতিবাহিত হল।

প্রতিদিন অন্য কেউ যে পুজো করে যায় এটি ঋষি বেদ ক্রমে বুঝতে পারছিলেন। সেই পুজোর ধরন দেখে সিন্ধুমুনির ভ্রাতা বেদ ভাবলেন কত কষ্ট করে এই শুভ কন্দ, দিব্য পুষ্প, মূল ও ফল দিয়ে পুজো করি। আর গাছের পাতায় রক্তমাখা মাংস দিয়ে কে এমন পুজো করে যায়! লুকিয়ে সেই পূজারিকে দেখতে হবে। এতে তো পরমপ্রিয় শিবকে অপমান করা হয়! এই চিন্তা করে বেদ ভিক্ষায় না গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। অবশেষে সেই ভিল শিব সন্নিধানে উপস্থিত হলেন। বেদ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, সেই নরমাংসভোজী ব্যাধ উপস্থিত হতেই লিঙ্গশরীর থেকে দেবাদিদেব আবির্ভূত হয়ে ভিলকে বললেন, 'সখা! আজ তোমার আসতে বিলম্ব হল কেন? আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। তুমি কি আজ বেশি শিকার করেছ? তাই বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ! তুমি তো জানো তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করি।'

শিব ও ব্যাধের এই কথোপকথন শুনে বেদ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ব্যাধের সঙ্গে প্রভুর এমন সম্বন্ধ! বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁর মনের কোণে ক্রোধেরও সঞ্চার হল। ব্যাধ পুজো করে স্থান ত্যাগ করতেই ক্রোধী বেদ শিবের সম্মুখে এলেন।

নিজের পবিত্রতার উপর অত্যন্ত আস্থাশীল বেদ শিবের সম্মুখে এসে বললেন, 'এই ব্যাধ পাপকর্মকারী, শাস্ত্রজ্ঞানহীন, ক্রূর। তাকে তুমি নিজের রূপ দেখালে, তাঁর সঙ্গে কথা বললে! আর আমার সঙ্গে তো একটাও কথা বল না! তোমার মাথায় শিলাপাত করা উচিত।'

বেদের এই কথা শুনে শিব বললেন, 'বেশ আমার মাথায় তুমি শিলাপাত কর তাতে আপত্তি নেই, তবে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর। কাল ভিল যখন পুজো করতে উপস্থিত হবে তখন এসো।'

পরদিন বেদ এসে দেখলেন লিঙ্গের ভিতর থেকে রক্তের ধারা নির্গত হচ্ছে। তিনি এত রক্ত এখানে কী করে এল —এই চিন্তা করে ভালো করে জল দিয়ে লিঙ্গকে ধুইয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে ভিল এসেও সেই রক্তের স্রোত লিঙ্গমধ্যে দেখতে পেলেন। তা দেখে স্তব্ধ ভিল বললেন, 'আমি প্রভুকে রক্ষা করতে পারিনি! আমি নিজেকে রক্তাক্ত করে তুলব।'— এই বলে তীক্ষ্ণ শর দিয়ে নিজেকে রক্তাক্ত করতে শুরু করলেন। শিব তখন দর্শন দিয়ে বেদকে বললেন, 'দেখ, তুমি কেবল জল দিয়ে আমাকে ধুইয়ে দিলে। আর এই ভিল আমার কষ্টে নিজেকে রক্তাক্ত করে তুলল। তোমাদের দু'জনের মধ্যে ভালোবাসা, ভক্তি বিষয়ে কতটা পার্থক্য। তবে আমি তোমাদের দু'জনের উপরই তুষ্ট হয়েছি। তোমাদের দু'জনকেই বর দেব। তবে আগে ব্যাধকে।'

ব্যাধ বর চাইলেন এই তীর্থ যেন তাঁর নামে পরিচিত হয়। সেই থেকে এই তীর্থের নাম হল ভিল্লতীর্থ। তারপর বেদকেও তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী নানা বর প্রদান করেন শিব।

পূর্বা সেনগুপ্ত

একটু জানুন একটু ভাবুন

বিদেশের মাটিতে প্রথম তেরঙ্গা উত্তোলন

১৫ আগস্ট, ১৯৪৭। স্বাধীনতার আনন্দে আত্মহারা ভারতবাসী। ২০০ বছরের ইংরেজ আধিপত্য ও নিদারুণ অত্যাচারের দিন শেষ হয়েছিল স্বাধীনতার মাধ্যমে। নতুন দিনের শুভ সূচনা তো একদিনে হয়নি। মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে দেশবাসীর দীর্ঘদিনের আন্দোলন, আত্মবলিদানের ফল ছিল স্বাধীনতা। তেরঙ্গা ভারতের স্বাধীনতার প্রতীক। বিশ্ব দরবারে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার প্রতীক। এই তেরঙ্গা প্রত্যেক ভারতবাসীর গর্ব। আমরা জানি, তেরঙ্গার নকশা তৈরি করেছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী পিঙ্গালি বেঙ্কাইয়া। ১৯০৬ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার আকাশে প্রথমবার উড়েছিল ভারতের জাতীয় পতাকা। অবশ্য তার নকশা অন্যরকম ছিল। তবে বিদেশের মাটিতে প্রথম ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ভিকাজি রুস্তম কামা। ১৮৬১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর এক ধনী পার্সি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ভিকাজি। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ব্যবসায়ী সরাবজি ফ্রামজি প্যাটেলের কন্যা। ১৮৮৫ সালে তিনি বিখ্যাত আইনজীবী রুস্তমজি কামার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হন। রুস্তমজি মূলত ব্রিটিশদের অধীনেই কাজ করতেন। কিন্তু ভিকাজির মধ্যে ছিল ভারতের প্রতি তীব্র টান। ছিল প্রবল জাতীয়তাবোধ। স্বামী ব্রিটিশ আইনজীবী হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন তিনি। ফলত রুস্তমজির সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়।

উল্লেখ্য, ১৯০৭ সালে জার্মানির স্টুটগার্টে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক মহাসভায় সর্বপ্রথম তেরঙ্গা পতাকা ওড়ান ভারতকন্যা ভিকাজি রুস্তম কামা। ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারত মুক্তির আওয়াজ তোলেন তিনি। তবে বর্তমান পতাকা নয়। সেই তেরঙ্গা ছিল ভারতের জাতীয় পতাকার প্রথম দিকের সংস্করণ। যদিও পরবর্তীকালে শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মার সঙ্গে ভিকাজি যৌথভাবে ভারতের জাতীয় পতাকার নকশাও তৈরি করেন।

প্রশ্ন

১. ভারতের জাতীয় পতাকা কবে গৃহীত হয়েছিল?
২. 'ফ্ল্যাগ কোড অব ইন্ডিয়া' আইনটি কত সালে চালু হয়?
৩. জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত কী?
৪. কলকাতার কোথায় প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয়?
৫. জাতীয় পতাকার ছবি কবে প্রথম ডাকটিকিটে স্থান পেয়েছিল?

উত্তর

১. ২২ জুলাই, ১৯৪৭।
২. ২০০২ সালে।
৩. ২:৩।
৪. পার্সিবাগানে।
৫. ১৯৪৭ সালের ২২ নভেম্বর।

অনির্বাণ রক্ষিত

শব্দপ্রবাহ

ছক-২

	১	২		৩	৪	৫		৬	৭
৮		৯			১০				
১১	১২			১৩				১৪	
১৫			১৬				১৭		
	১৮	১৯			২০	২১			
২২		২৩		২৪		২৫		২৬	
২৭	২৮			২৯	৩০			৩১	৩২
৩৩			৩৪				৩৫		
		৩৬				৩৭			
৩৮			৩৯				৪০		

সূত্র:

পাশাপাশি: ১ ভাদ্রের ফল ৩ নিজের ৬ কর্ম ৯ কানের নরম অংশ ১০ বড় কাটারি ১১ পাখির ডানা ১৩ মাছ ১৪ চিন্তা ১৫ নিযুক্ত ১৬ মন্দ ১৭ কাল ১৮ কন্দর্প ২০ প্রকার ২৩ স্বামীর দিদি ২৫ অকুটিল ২৭ সূর্য ২৯ জমির পরিমাণ ৩১ বিরামচিত্র ৩৩ দল ৩৪ পঙ্‌ক্তি, সারি ৩৫ অবরুদ্ধ ৩৬ ছোট ঢাকজাতীয় বাদ্য ৩৭ মুকুট ৩৮ বল্লরি ৩৯ নগর ৪০ এক পাখি।

উপর-নীচ: ২ সুন্দরী নারী ৪ শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ৫ প্রণম্য ৭ পানকৌড়ি ৮ অকূল ১২ শেষ ১৩ মৃত ১৪ খটাশ জাতীয় জন্তু ১৬ রাজস্ব ১৭ যুদ্ধ ১৯ লবণাক্ত ২১ সমৃদ্ধ বা গণ্ডগ্রাম ২২ জনসাধারণের চিকিৎসাকেন্দ্র ২৪ জোগান ২৬ চীনা ফলবিশেষ ২৮ ছোট জলাশয় ৩০ কুঁড়ি ৩২ গজদন্ত ওঠেনি এমন হস্তীশিশু ৩৪ গগন ৩৫ অদ্ভুত।

বিভাংশু দত্ত

• গত সপ্তাহের সমাধান

ছক-১

	অ	মি	ত্র			দী	প	ক	
শো	ভি	তা		ঋ	ভু		থ	ম	ক
ধ	নি	চা		তি	ক্ত		ভো	লা	য়
	বে	র	ন			তা	লা	ক	
খো	শ		ট	ম	ট	ম		র	মা
লা			ব	রা	ব	র			ক
	ভো	ম	র			স	মা	ধা	
ম	গ	ন		বা	ক		ন	ব	ম
ত	ব	কি		হ	ল্লা		তা	মা	শা
	তী	র	স্থ			আ	সা	ন	

ইতিহাসে ডিএনএ

মেয়েদের বিজ্ঞান পড়া ও গবেষণার আঙিনা উপযোগী করে তোলার লড়াইয়ে এক অবিস্মরণীয় নাম রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন। কর্মজীবনে তিনি ভৌত রসায়নবিদ হিসেবে নিজের পরিচিতি গড়ে তোলেন। পরে প্যারিস গিয়ে এক্স রে. কেলাসবিদ্যায় দক্ষতা তৈরি হয়। কিংস কলেজে এই কাজের উপযোগী ল্যাবরেটরি তৈরি ও প্রোটিনের বদলে ডিএনএ-র গঠন নিয়ে গবেষণার কাজে যুক্ত হন তিনি। তার পরের ইতিহাস, দ্রুত ডিএনএ-র গঠন কৌশল আবিষ্কার। সেই কাহিনিই অরুণাভ মিশ্রের 'রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন এবং ডিএনএ' বইটির বিষয়বস্তু। আলোচিত হয়েছে কীভাবে বংশগতি রহস্যের জট খুলল। আর সেই জট খুলতে রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন, মরিস উইলকিন্স, জেমস ওয়াটসন, ফ্রান্সিস ক্রিক ও লাইনস পাউলিংয়ের অবদান তুলে ধরা হয়েছে বইতে।

'জিন-কথা ও ডিএনএ ধ্বনি' অধ্যায়ে জিনতত্ত্বের কথা আছে। এই তত্ত্ব আলোচনা করতে হলে গোড়াতেই যাঁর কথা মনে আসে তিনি গ্রেগর জোহান মেন্ডেল। মটর গাছ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করে তিনি দেখলেন বাবা-মায়ের কিছু গুণাবলি পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে সঞ্চারিত হয়। এগুলিকে তিনি নাম দিয়েছিলেন 'ফ্যাক্টর'। পরে এই ফ্যাক্টরই পরিচিত হয় 'জিন' নামে।

ফ্রাঙ্কলিন ভৌত রসায়ন বিজ্ঞানী হয়েও জীববিজ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে কাজের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কারণ ডিএনএ অণুকে ঘিরে তাঁর ক্রমবর্ধমান আগ্রহ। আমরা জানি ক্রমোজোমের মুখ্য উপাদান হল— ডিএনএ। ১৮৭২ সালে যার আবিষ্কার হয়েছিল ফ্রেডরিক মেইশ্চারের হাতে। আরএনএ নিউক্লিয়াসের বাইরে থাকে বলে তাকে জিনগত তথ্যের আদানপ্রদানে সহায়ক বলে ভাবা হতো না। ডিএনএ-তে মাত্র চারটে নিউক্লিওটাইড পরপর অদলবদল হয়ে ডিএনএ চেন তৈরি করে। আর প্রোটিনের চেনে থাকা ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিড অদলবদল হয়। ফলে জিনতত্ত্ববিদরা ডিএনএ নয়, বংশগতির জন্য প্রোটিন নিয়েই বেশি আগ্রহী ছিলেন। এরমধ্যে ১৯৩৬ সালে অসওয়াল্ড আভেরি ইঙ্গিত দিলেন ডিএনএ-র মাধ্যমে গুণাবলি পরের প্রজন্মে সঞ্চারণের।

শেষ অধ্যায় 'ব্রিকবেক পর্ব'-তে আলোচিত হয়েছে মোজেইক ভাইরাস। এটি অত্যন্ত সাধারণ, স্থিতিশীল আর দ্রুত সংক্রমণ ক্ষমতা ধরে। ১৯৫০ সাল নাগাদ জানা যায়, এই ভাইরাসের শরীরে প্রোটিনের সঙ্গে ডিএনএ নয়, আরএনএ রয়েছে। ১৯৫৫ সালে ফ্রাঙ্কলিন ও হোমস দেখান টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাসের শরীরের দেওয়ালটা প্রোটিনের, আর সেই প্রোটিনের গঠন হেলিক্যাল। এরপর ১৯৫৭ সালে তিনি শুরু করেছিলেন টিএমভি-র মডেল তৈরি কাজ। তবে তাঁর মডেল উদ্বোধনের আগের দিনই তিনি মারা যান।

রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন এবং ডিএনএ ॥ অরুণাভ মিশ্র ॥ জ্ঞান বিচিত্রা ॥ ৩৫০ টাকা।

• **অনির্বাণ রক্ষিত**

মেলায় মেলায় পত্রভারতীর বই

তমোঘ্ন নস্কর

মা কালী বাঙালির প্রাণ ও সংস্কৃতিতে তিরতির করে বয়ে চলা অপারবিসারী নদী। তাতে মহার্ঘ্য প্রস্তরখণ্ড থেকে দুই পাড়ের মাটি সবই এসে পলি হয়ে মিশেছে। রাজা, উজির, সাধক, ভিখারি, অজস্র রচয়িতা, অজস্র পদ, অজস্র সুর সবই মায়ের নামেই উৎসর্গীকৃত।

কালী কথা 300/-

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

ময়নামতীর নথ 325/-

কাশ্মীর সুন্দরী 450/- জলঙ্গীর অন্ধকারে 350/-
মৃত্যুর গন্ধ মিষ্টি 225/- বন্দর সুন্দরী 350/-
সোমনাথ সুন্দরী 395/- খাজুরাহো সুন্দরী 325/-

অভীক সরকার

পাঁচটি রহস্য উপন্যাস 340/-

মহাদেবী 275/-

খোঁড়া ভৈরবীর মাঠ 150/-
পটমঞ্জরী 399/- পেতবত্থু 225/-

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

এক ডজন গা ছমছমে গল্প এবং একটি হাড় হিম করা উপন্যাস, যা পড়ার বহু পরেও শিহরন জাগাবে।

গভীর রাতে দিঘির ধারে 399/-

আদরের রঙ 299/- সাধু ওঝা আসছে 275/-

ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়

দেশের দুই প্রান্তে দুই 'আলিয়া'। মর্মস্পর্শী রুদ্ধশ্বাস উপন্যাস।

আলিয়া 325/-

আসছে **কাচের স্বর্গ** 325/-

পত্রভারতী আসছে আপনার কাছের বইমালায়

বারাসাত, ঘাটাল (পশ্চিম মেদিনীপুর), চন্দননগর, চাকদহ, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, ময়নাগুড়ি, সিঙ্গুর, নৈহাটি এবং অন্যত্র।

QR CODE স্ক্যান করলেই ক্যাটালগ

পত্রভারতী 3/1 কলেজ রো, কলকাতা 9
www.patrabharati.com
9830806799 9433075550

সঙ্ঘের প্রকাশিত জনপ্রিয় বই

সাধক সাধিকা	—	২০০
ভ্রমণ	—	১০০
তীর্থ পরিষেবা	—	২০০
নমঃ শিবায়	—	১১০
হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব	—	২৫০
হিন্দুশাস্ত্র পরিচয়	—	৪০০
ভাগবত (গদ্যে)	—	৪০০
ভাগবত চরিত্র	—	১৫০
ভাগবত কথা	—	১০০
দেবদেবীর বাহন	—	১২০
দীক্ষা প্রসঙ্গ	—	৬০
স্তোত্রাঞ্জলি	—	৮০
বাণী ও নির্দেশ	—	৬০

নতুন বই

সহজ বাংলা গদ্যে **উপনিষদ**	—	২০০
স্বামী প্রণবানন্দজীর সাধনা ও **অলৌকিক লীলা**	—	১০০
তীর্থ পরিষেবা	—	২০০
অধ্যাত্ম রামায়ণ	—	২৫০
শ্রীমদ্ভগবদগীতা	—	৩০০

রুদ্রাক্ষ

প্রাচীনকাল হতে মুনি ঋষিগণ রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, তাঁরা নিশ্চয় শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তি পান। কারণ এতো রুদ্রের অর্থাৎ শিবের অক্ষ থেকে উৎপন্ন। আপনিও ধারণ করুন প্রকৃত রুদ্রাক্ষ, অবশ্যই সুফল পাবেন। ১ থেকে ১৬ মুখী রুদ্রাক্ষ সঠিক মূল্যে পাবেন। এছাড়াও রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিক মালা পাওয়া যায়।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
প্রকাশন বিভাগ
২০৯, রাসবিহারী এভি. বালিগঞ্জ, কোল-১৯
হোয়াটসঅ্যাপ, মোঃ - 9088965818, 9231878111
Website - https://bsspublication.com

প্রেম ও অহিংসার ভাবনা

‘সম্মিলিত ভিক্ষুদের মতামতই হল সঙ্ঘের প্রকৃত শক্তি। তোমরা পূর্বের ন্যায় সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে সঙ্ঘ পরিচালনা কোর। তাতেই সঙ্ঘের হিত।’ এ কথা বলার পর ধীরে ধীরে ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসতে লাগল। বুদ্ধদেব বললেন, ‘সমুদয় সৃষ্ট বস্তুই ধ্বংসশীল। তোমরা নির্ভুলভাবে নিজেদের কার্য সম্পাদন কোরো।’ এই হল বুদ্ধের শেষ বাণী। তারপর তাঁর চোখ বন্ধ হল। ধ্যানস্থ হলেন। ভগবান বুদ্ধের জীবনপ্রদীপ-শিখা নিভে গেল। তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করলেন। মেদিনীতে কম্পন অনুভূত হল। কোথা থেকে ভেসে এল শঙ্খনাদ। ভগবানের শয্যাপাশে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন ভিক্ষু শ্রমণের দল। কুশীনগর, বৈশালী, কপিলাবস্তু, রাজগ্রাম, পিপ্পলিবন সর্বত্র। খবর চলে গেল। মহামানবের নশ্বর দেহ দর্শনের জন্য, প্রণাম জানানোর জন্য সাত দিন রাখা থাকবে। তারপর নশ্বর দেহের দাহকার্য সম্পন্ন হবে।

কুশীনগরে মল্লরাজের প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় যেখানে তাদের অভিষেক সম্পন্ন হয় সেই ‘মুকুটবন্ধন’ মণ্ডপে সম্পন্ন হল দাহ কার্য। উপস্থিত রইলেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা রাজা, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা।

বুদ্ধদেবের প্রেমময় বরাভয় রাজার স্বর্ণখচিত রাজপ্রাসাদ থেকে শুরু করে দরিদ্রের পর্ণ কুটির পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৌদ্ধ, শাস্ত্রকার, চর্মকার সকলেই শেষ যাত্রায় শামিল। দেহে অগ্নিসংযোগ হল। তারপর ধীরে ধীরে অগ্নি গ্রাস করল সমগ্র শরীর। স্তূপ নির্মাণে আপত্তি ছিল বুদ্ধদেবের। তিনি চাইতেন স্তূপ নয়, তাঁর মৃত্যুর পর জেগে থাকুক তাঁর প্রেম ও অহিংসার ভাবনা। শরীর সম্পূর্ণ দগ্ধ হওয়ার পূর্বেই বৃষ্টি শুরু হল মুষলধারে। বৃষ্টির জল ও শ্রমণদের অশ্রুতে মিশে গেল ধরিত্রী। বৃষ্টি যখন থামল চিতার আগুন নিভে গিয়েছে। অঙ্গারের মধ্যে থেকে দেখা দিল পবিত্র দেহাবশেষ। কুশীনগর, কপিলাবস্তু, বৈশালীর রাজারা বুদ্ধের দেহাবশেষ সংগ্রহ করতে চাইলেন। দেহাবশেষের অধিকার নিয়ে শুরু হল বাকবিতণ্ডা। অহিংসার মূর্ত প্রতীক যিনি তাঁর দেহাবশেষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় হিংসার জন্ম হল। ভিক্ষু ক্ষেম ভগবানের ভস্ম সংগ্রহ করতে এসে ভগবান বুদ্ধের বাম চক্ষুদন্ত ‘শেষ চিহ্ন’ রূপে পেলেন। আর ভগবান বুদ্ধের সেই শেষ চিহ্ন নিয়েই হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্তের উপন্যাসের সূচনা ও বিস্তার। ভগবান বুদ্ধদেব সম্পর্কিত ইতিহাস নির্ভর একটি বস্তুনিষ্ঠ উপন্যাস লিখেছেন হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত।

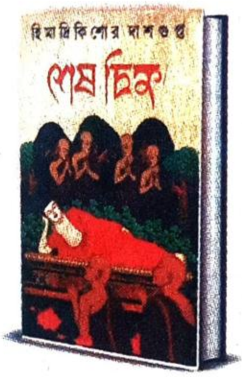

ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ-এর পরবর্তী সময়কালের উপস্থাপনায় তৈরি হয়েছে এই উপন্যাস। কলিঙ্গ থেকে পাটলিপুত্র, কপিলাবস্তু থেকে কুশীনগর পর্যন্ত উপন্যাসের কাহিনি বিস্তৃত। শেষ হয়েছে শ্রীলঙ্কার পবিত্র ক্যান্ডি বুদ্ধ মন্দিরে। দন্তধাতুকে বারবার নষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। চক্রান্ত হয়েছে। এ নিয়ে যুদ্ধও বেধেছে। পালি গ্রন্থে দাঠাবংস থেকে উপন্যাসের বিষয় আহরিত হয়েছে। লেখক কোথাও কোথাও কল্পনা ও ইতিহাসকে আশ্রয় করেছেন। উপন্যাসটি তাই অসাধারণ পাঠযোগ্য হয়েছে। এই বই লিখতে গিয়ে লেখক যে প্রচুর বই পড়েছেন, পরিশ্রম করেছেন একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ‘শেষ চিহ্ন’ হিমাদ্রিকিশোরের সাহিত্য জীবনের এক অমূল্য রত্ন হিসেবে বিবেচিত হবে।

শেষ চিহ্ন ॥ হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত ॥ পত্রভারতী (৩/১, কলেজ রো, কল-৯) ॥ ২৯৯ টাকা।

• **অরুণ মুখোপাধ্যায়**

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

• **ডাঃ অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত** তাঁর **‘এক গাঁয়ের ডাক্তারের গল্প’** বইটিতে এক মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক বেলপুকুর হাসপাতালকে ধীরে ধীরে উন্নত করার প্রচেষ্টাকে দেখানো হয়েছে। বেলপুকুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসাররূপে চিকিৎসক লেখক অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত কীভাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে নিজের ভেবেছেন এবং কর্মীদের হাসপাতালের প্রতি দায়বদ্ধ করিয়েছেন তা স্পষ্ট হয়েছে।

প্রথমে অবিশ্বাস, তারপর আধা বিশ্বাস, সেখান থেকে নির্ভরতা বেড়েছে রোগীদের। সহজ থেকে জটিল অপারেশন এবং নানা রকম চিকিৎসা সংক্রান্ত জটিলতা ডাক্তারবাবু লিখে গিয়েছেন।

রোগী বাড়ছে কিন্তু চিকিৎসার সরঞ্জাম

সেভাবে আসছে না। এইদিকেও নজর রয়েছে। বইটির প্রকাশক: **গুরুচণ্ডা৯।** **দাম:** ১২০ টাকা।

• **জয়ন্ত ঘোষের** ১৭টি গল্পের গ্রন্থ **'ইচ্ছে নদীর গল্পেরা'।** জবালা, কাজের লোক এবং বাবু চরিত্র, ভয়, মধুমেহ, সেরা পরিবার, রমণী, দিগম্বর বনাম ঘুঘু, ইউনিয়ন জ্যাক, সুখ অসুখ, রহস্যের নেপথ্যে, হড়কা, কালো শশীর জোয়ার ভাটা, যে নদী মরুপথে, রহস্য চলভাষে, মধুরেণ, স্ব-নিবন্ধ, গজাননের ভূত দর্শন গল্পগুলির মূল কথা হল মানুষ। মানুষের সুখ-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা, প্রেম-অপ্রেম সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। মানসিক দ্বন্দ্বের এমন বহির্মুখী প্রকাশ গল্পগুলির আবহকে মেদহীন করেছে। **প্রকাশক: বইওয়ালা বুক ক্যাফে।** (রতনপল্লি, শান্তিনিকেতন-৭৩১২৩৫)। দাম: ২০০ টাকা।

• জীবনের চলার পথে বিভিন্ন সময়ে অর্জিত এবং উপলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গল্প লিখেছেন **কপিল কর্মকার**। তাঁর ছোটগল্প সংকলনটির নাম **'উপলব্ধি'**। বয়ে যাওয়া জীবনের সময় যদি একত্রিত করে মালা গাঁথা হয় তাহলে তা অনেক সময় মানুষের কাজে লাগে, সেকথা ভেবেই কপিলবাবু তাঁর গল্পগুলি নির্মাণ করেছেন। অকৃতজ্ঞ, অপত্য স্নেহ, অসময়ের বন্ধু, ঈর্ষা, গোপন চিঠি, ধর্ম, পরীক্ষার পড়া, প্রতারিত ইত্যাদি গল্প জীবনের কথা বলে। ফেলি, সোহাগীর দুঃখ মিশ্রিত জীবনচর্যা, বন্ধুর দাদার বিয়েতে গিয়ে লেখক যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা পড়তে গিয়ে অবাক হতে হয়। লেখক তাঁর লেখার মধ্যে মানবিক সম্পর্ককে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। সেই সম্পর্ক যা কখনও সুগন্ধ ছড়ায়। কখনও বা দুর্গন্ধ। জীবনের ভালো-মন্দ, দুঃখ-হিংসা এবং মানবিক দিকটাকে তিনি 'উপলব্ধি'তে ধরতে চেয়েছেন। গ্রন্থটির প্রকাশক: **আন্তর্জাতিক প্রকাশন** (৮৫ বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট)। **দাম:** ৩০০ টাকা।

• অবিশ্বাস, হিংসা-বিবাদ, দ্বন্দ্বে উন্মত্ত পৃথিবীতে ভালোবাসা অত্যন্ত দুর্লভ। ভালোবাসার যে কত রকমফের থাকে তা কতটুকু জানি। আমরা মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে খুবই চিন্তিত। চাই গড়ে উঠুক এক হিংসামুক্ত উন্নত সমাজ। প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের কেমনভাবে জীবন চালানো উচিত বা আচরণ করা উচিত তা জানার জন্য এই ধরনের বই পড়া উচিত। তত্ত্ব ও তথ্য, কল্পনা, স্বীকার, সূত্র, সিদ্ধান্ত, সমাধান ও কারণগুলি জানলে মানুষ উপকৃত হবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে লেখক বইটি লিখেছেন। এরই মাঝে মানুষ হিংসা বিবাদ না করে একে অপরকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করলে মানুষই উপকৃত হবে। মানুষের চরিত্রের যে তত্ত্ব, সত্যের তত্ত্ব, ন্যায়-অন্যায়, বিশ্বাসের তত্ত্ব এবং ভালোবাসা ও মানবতার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন **হেমন্ত তরফদার** তাঁর **'ভালোবাসার তত্ত্ব'** গ্রন্থটিতে। **প্রকাশক: উদার আকাশ,** (ঘটকপুকুর, ডাক: বি গোবিন্দপুর-৭৪৩৫০২,থানা ভাঙড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা) **দাম: ২০০ টাকা।**

• দীর্ঘদিন ধরে শ্বশুরালয় বাংলাদেশে ভ্রমণ করেছেন স্বপ্নারুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাসপোর্ট বানিয়ে নেওয়া থেকে ভিসা পাওয়া, বাংলাদেশ যাওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা, ভ্রমণের আবহ, নানা তথ্য, ১৯৮৮ সালের বন্যার সময়ে ভয়াবহ বাংলাদেশের চিত্র, শিলাইদহের কুঠিবাড়ি ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লেখক লিখেছেন। খানখানাপুর, বাণীবহর স্মৃতি, মীর কাশেম আলির সঙ্গ, চট্টগ্রামের বালুচরা, ঝিনাইদহের ফুলহরি গ্রামের মধুর স্মৃতি, কক্সবাজার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। **স্বপ্নারুণ বন্দ্যোপাধ্যায়** রচিত **'বাংলাদেশে আমি'**-এর মুদ্রক লেসার আর্ট, শ্রীরামপুর। **প্রকাশক: স্বপন ব্যানার্জি,** হালিশহর। **দাম: ২০০ টাকা।**

আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী
নতুন ভাবে, নব সাজে প্রকাশিত হল
CORE MATHEMATICS
K. C. Nag ₹695
অমুল্য আকর গ্রন্থ, যেন অঙ্কের অভিধান !
কোর গণিত
কেশবচন্দ্র নাগ
• নতুন সংস্করণ • ₹695
আমাদের ইংরেজি বই
সেই পুরানো বইয়ের ৫২তম সংস্করণ
A Text-Book of
Higher English Grammar, Composition & Translation
by P. K. De Sarkar ₹695
Anglo-Bengali Edition • Unabridged Version
Book Syndicate
35 College Street, Kolkata-700 073
✆ 2241 0275 @ booksyndicate.35@gmail.com

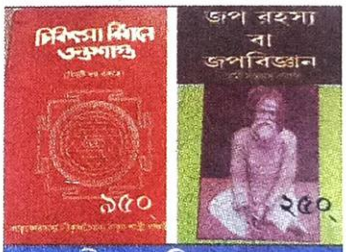

প্রাচী পাবলিকেশনস্
মোবাইল: ৯৩৩৯১০৮০২৪
কলেজস্ট্রীটএ লভ্য

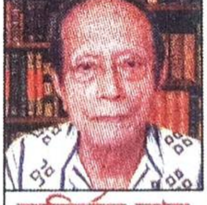

বিশ্বসেরা ১০০ বিজ্ঞানীর মতে রাজপুরবাসী সুনির্মল রায়-এর বিশ্বসেরা আবিস্কার আলো, শব্দ, তাপের সঙ্গে দেহমনের সম্পর্ক, জড় জীবের ব্যবহার ও সব নিয়মের মূল নিয়ম, এগুলো নোবেলজয়ী যে কোন আবিস্কার থেকে কি খারাপ? জানতে দেখুন সুনির্মল রায়-এর বই ও CD
সুনির্মল রায়
শতকসেরা বিজ্ঞানীলেখক বিশ্বসেরা ৬৫টি গ্রন্থের জন্য বহবার জাতীয় আন্তর্জাতিক সম্মানপ্রাপ্ত
"ব্রহ্মাণ্ড চেতনায় জড় জীবের প্রকাশ"
7980804561
শিক্ষাতীর্থ ৬৫/৩ এম. জি. রোড, কোলকাতা-৯

প্রসব বিজ্ঞানের এক পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তক
ধাত্রীবিদ্যা
আর. গুপ্তা
মূল্য ঃ ১৫০ টাকা মাত্র
অন্যান্য স্বাস্থ্যের বইয়ের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন
অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স
কোলকাতা-৭০০০৭৩
Phone : 2257-1071, 2241-4857
E-Mail : contact@academicpublishers.in
Website : www.academicpublishers.in

মৃত্যুর আগে

মানুষ কী কী অনুভব করে?

জাগতিক চিন্তায় যারা ব্যস্ত, সর্বদা টাকা টাকা করছেন, লোক ঠকানো, হেনস্তা করা, এমন মানুষের শরীরে হঠাৎ জড়ত্ব ধরে। তাঁরা অচেতন হয়ে দীর্ঘকাল থাকেন এবং শরীরের দুর্ভোগ বুঝতে পারেন না। কিছু মানুষের থাকে দেবচৈতন্য। তাঁরা মৃত্যুর আগাম সংকেত পান। শেষ সময়ে জাগতিক দায়-দায়িত্ব উত্তরসূরিদের হাতে দিয়ে যান। আর এক দল আছেন মৃত্যুমুক্ত। শ্রীঅরবিন্দের দেহত্যাগের পর অনুরাগীরা দেখেন তাঁর শরীর আলোকময়! আনন্দময়ী মায়ের শরীরত্যাগের পর তিনদিন ধরে তাঁকে ঘিরে ছিল সাদা আলোর বলয়। সাধারণ মানুষও টের পান শেষ ক্ষণের আগাম বার্তা। তখন তাঁরা কী দেখেন? কারা মুক্ত হন? কিন্তু বাসনা যাঁদের প্রবল, তাঁদের কী এ সংসারে ফিরে আসতেই হবে।

লিখেছেন সোমব্রত সরকার।

মৃত্যুর আগে মানুষের কী কী পরিবর্তন হয়?

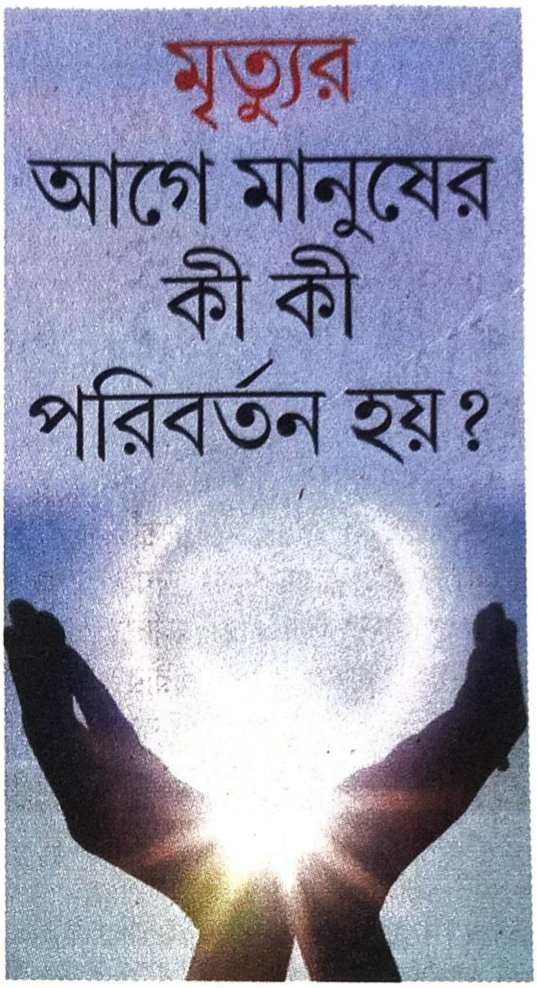

মৃত্যুরহস্য: একটা দীপশিখা সবসময় আমাদের মধ্যে জ্বলছে। হৃদয়ের ওপর নয়, খুব গভীরে শিখাটি সর্বক্ষণের জন্য জ্বলেই রয়েছে। বিশেষ পুজো-পার্বণে অনেক মহাত্মা অখণ্ড প্রদীপ জ্বালাতে বলেন। প্রাচীন মঠে অখণ্ড দীপ বা ধুনি জ্বালানো থাকে। বছরের পর বছর ধরে জ্বলছে দীপ। এই প্রদীপই প্রভারূপে, জ্যোতিরূপে ব্যাপ্ত হয়ে আছে আমাদের মধ্যে। ওটাই হল নিজের মধ্যকার চেতনার আলো। আত্মসত্তার অনুভব হৃদয়ে একটা বিন্দুর মতন করতে করতে ওই আলোটা একটু একটু করে রোজকার সাধনায় বুদবুদের মতো উঠে দীর্ঘকালের প্রচেষ্টায় অখণ্ড দীপশিখা স্বরূপ উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ধ্যান করতে করতে আলোটা প্রথমে আসবে হৃদয়ের পুরোভাগে, তারপর অনুশীলনে ক্রমশ তলিয়ে যাবে মেরুতন্ত্রের মধ্যে। হৃদয়ের ওপরটাতে যখন মানুষের চেতনা থাকে তখন নানারকম ভাব বা আবেগ আসে। এটি কখনও কখনও তো ভীষণ ক্ষতিকর। ওই আবেগের বশবর্তী হয়ে আমরা কত রাগ-ঈর্ষা-হিংসা ছড়িয়ে থাকি। পরে যখন বুঝতে পারি, নিজেই কষ্টটা পাই। স্থূলচেতনা থেকে এ ধরনের অভিব্যক্তি আসে আমাদের মধ্যে। চেতনা যখন হৃদয়ের গভীরে দীপশিখার মতো জ্বলে তখন আত্মসত্তার অনুভবটা আমাদের কাছে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। একেই সাধকেরা বলছেন, ব্রহ্মের অনুভব।

প্রাচীন ঋষিরা আমাদের জানিয়েছেন, চেতনার ধারা যখন ঊর্ধ্বগামী হয়, ওপরের দিকে উঠতে থাকে তখনই তার একটা বাইরের লক্ষণ দেখা যায়। এই যেমন হঠাৎ হঠাৎ আমরা রেগে যাই, লোকে বলে মাথাগরম, ওটা আসলে কিন্তু কিছুই নয়, চেতনার তাপের ক্রিয়া। কিন্তু ওই তাপটা যখন অন্তঃশীতলতা লাভ করে, বাইরে তা না বেরিয়ে ভেতরে নেমে যায়। হৃদয়ের মধ্যেই আগুনের একটা হলকা ছড়াতে থাকে, ওই

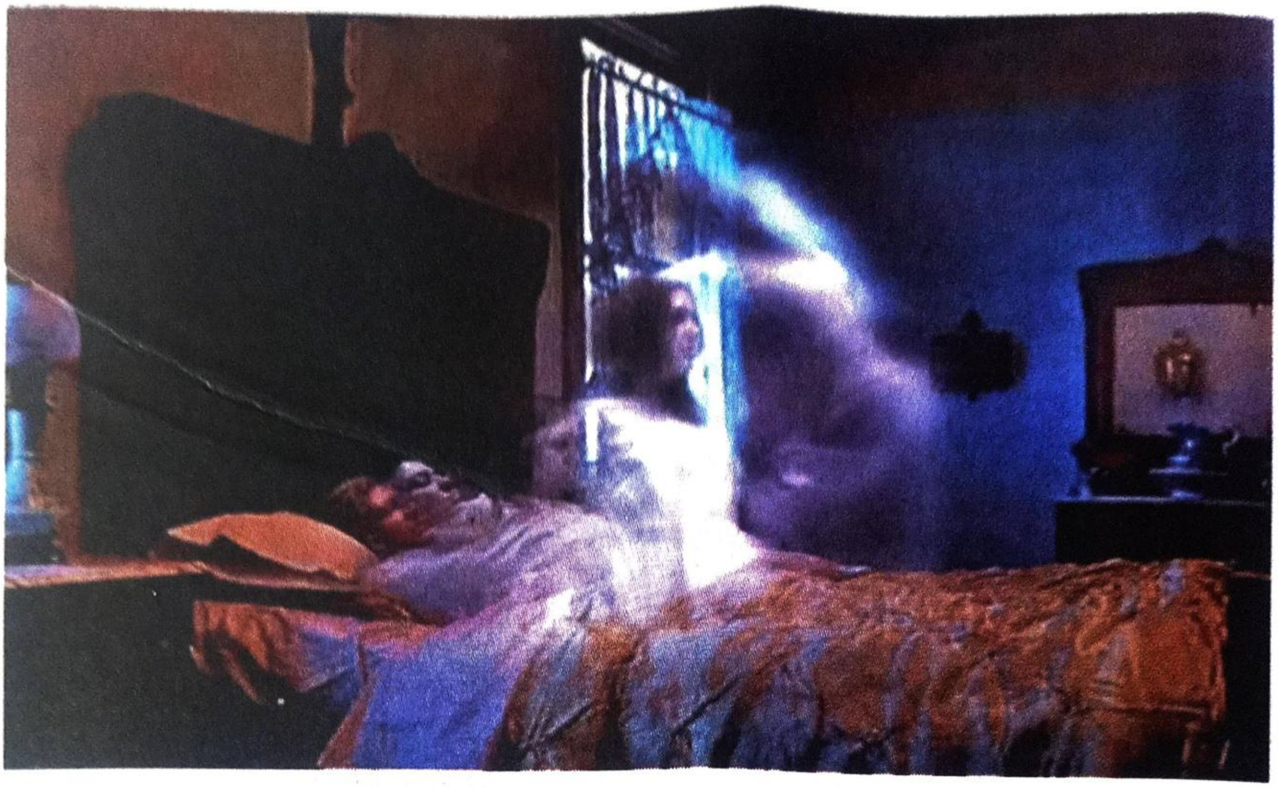

আগুনই ঘন হয়ে প্রদীপের মতো জ্বলে। দুর্গাপুজোর চারটি দিন অনেক প্রাচীন পুজোবাড়িতে অখণ্ড দীপ জ্বালানো হয়। এই প্রদীপ যদি হৃদয়ে জ্বালতে সক্ষম হই তাহলে আমরা দ্রষ্টারূপে যেতে পারব। অনেক কিছু আগে থেকেই দেখতে পাব। ঊর্ধ্বভাবনা, ঊর্ধ্বচেতনা একটি প্রাচীন যোগের শিক্ষা। বেদের ঋষিরা শিক্ষাক্রমটি চালু করেছিলেন ভারতে। ভাবতে হবে আমাদের বাইরে নয়, মেরুদণ্ডে থাকা দু'দুটো নাড়ির মধ্যে দিয়ে ভাবনাকে ওপরে তুলতে হবে। মেরুদণ্ডের মধ্যেই বাঁ-ধারে আছে সূক্ষ্ম একটা নাড়ি— যোগীরা এর নাম বলছেন, ইড়া নাড়ি। ইড়া নাড়ি খুব ঠান্ডা। তাই একে চাঁদের জ্যোৎস্নার সঙ্গে কল্পনা করা হয়েছে। চন্দ্রসমা ইড়া নাড়ি। মানুষের সূক্ষ্মচেতনার ধারা থাকে মেরুদণ্ডের মধ্যকার বাঁ ধারের ওই সূক্ষ্ম নাড়িতে। ওটা যাঁদের যত বেশি তরতাজা তাঁরা আগে থেকেই কোনও ঘটনার রূপরেখা ধরতে পারেন। কী ঘটতে পারে কিংবা কী ঘটবে তা তাঁরা দেখতে পান। তাঁদের দ্রষ্টাসত্তাটি থাকে অত্যন্ত প্রখর। মৃত্যুকে আগে থেকে তাঁরাই ধরতে জানেন, যাঁদের ইড়া নাড়ির স্রোতটা সব সময়ের জন্য ঊর্ধ্বরেতা থাকে, মানে ওপরের দিকে থাকে। এটা একটা যোগের পদ্ধতি। অনেকে আবার যোগ করেন না, কিন্তু কোনও সৃষ্টিকাজকে সুন্দর করে সাজিয়ে-গুছিয়ে মানুষের মনকে জয় করতে পারেন। পূর্বজন্মের কিছু ভালো সংস্কারের ফলে এঁদের আসলে ইড়া নাড়ির স্রোত ঊর্ধ্বমুখী হয়েই থাকে। এঁদের সিংহভাগই শিল্পী হন— গান করেন, সিনেমা বানান, লেখেন। মা সরস্বতীর যাবতীয় কর্মকাণ্ড এঁদের মধ্যে প্রতিভাত হতে দেখা যায়। মেরুদণ্ডের মধ্যেই ডান দিকে থাকে আরও একটি সূক্ষ্ম নাড়ি, যার নাম পিঙ্গলা। পিঙ্গলা নাড়ি সূর্যসমা। এর প্রচণ্ড তেজ। রাগ, ক্রোধ যাঁদের অত্যধিক বেশি তাঁদের পূর্বজ সংস্কারের বশে পিঙ্গলা নাড়ির স্রোত ঊর্ধ্বমুখী থাকে। অনেকেই রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে জানেন না, রাগ থেকে সংসারে তখন কত ধরনের ক্ষতি ও ক্লেশ আসে, শেষ পর্যায়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন পর্যন্ত হন। কিন্তু যদি যোগ অনুশীলন করা যায়, পিঙ্গলা নাড়িটিকে দমিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ওই রাগ, ক্রোধ নিমেষে নিয়ন্ত্রিত করে রাখা যায়। আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের ধারা বয় দুটো নাকে এটাই আমরা জানি। কিন্তু এই ধারণা সবটা ঠিক নয়। যখন শরীর খারাপ হতে শুরু করে, যখন কোনও বিপদ, দুর্বিপাক, কষ্ট আসতে চলেছে তখন সবার আগে জানিয়ে দেয় আমাদের শ্বাসের গতি। তখন এক নাকে চলে আসে শ্বাসের স্রোত। আবার যখন ভালো কিছু ভাবি আমরা, চিন্তা করি, উদ্ভাবন করি তখনও শ্বাসের ধারা এক নাকে থাকে। বাঁ-দিকের শ্বাসে থাকে আমাদের সূক্ষ্মচেতনা আর ডানদিকের শ্বাসে স্থূলচেতনা। যোগীরা দিনের বেলা বাঁ-দিক দিয়ে শ্বাস নেন। রাতের বেলা তাঁরা ডান দিক দিয়ে শ্বাসের ধারা চালান। যখন মানুষের দিন হয় তখন যোগীদের রাত, আর মানুষের রাতটা যোগীদের কাছে দিন। ওই সময়টায় তাঁরা শ্বাসের সাধনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'রাত্তিরে তো তিন ধরনের মানুষই জেগে থাকেন— যোগী, ভোগী আর রুগি।'

মৃত্যু আর কী? কিছুই তো নয়, ওই শ্বাসের ক্রিয়াটা চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। আমাদের পার্থিব শরীর, অবস্থা ও জগতের প্রতি আসক্তি একেবারে কম না হলে মৃত্যুকে বেঁচে থাকতে কখনও বোঝা যাবে না। মৃত্যুকে বুঝতে গেলে এবং তাকে কব্জা ও নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে বাসনা ও আকাঙ্ক্ষার ফর্দটিকে মুদিখানার মতো লম্বা করে নিলে চলবে না। দেশ কাল নিমিত্তের সীমার ওপরে যে অমরত্বের রাজত্ব রয়েছে ধ্যান চেতনার মধ্যে দিয়ে তা উপলব্ধ করেছিলেন বৈদিক ঋষিরা। তাঁদের উপলব্ধির ফলাফল কঠোপনিষদ। বাউল মরমিয়ারা অত্যন্ত সুন্দর একটা কথা বলেন। কুষ্টিয়ার লালন ঘরানার প্রবৃদ্ধ মরমিয়া লবান শাহ একবার এসেছিলেন ঘোষপাড়ায়। তিনি আমাকে বললেন, 'সাধনা করতে গেলে মরতে হয়। বেঁচে থাকতে গেলেও মরতে হবে। রোজ তোমার মনেতে থাকা কত কামনারাশি দেখ না, আপনা আপনিই মরে যায়। যে আশা ও স্বপ্নপূরণ হয় না তা তো ওই মৃত্যুরই শামিল। মরাটা তাই যদি অভ্যাস করতে পার তাহলে মৃত্যুকে ধরতে কোনও অসুবিধা হবে না। আমার গুরুজি বলতেন, 'জ্যান্তে মরা। বেঁচে থাকতেই

তুমি মরে যাও দেখি। ক্ষোভ বিক্ষোভ সব মার এবং মরো।'

বৌদ্ধাচার্যরা ওই একই কথা বললেন, 'সর্বম্ অনিত্যম্।' আজ আছ তো কাল নেই। জগৎ একটা চক্র। সমস্ত জগৎ চক্রের মতো ঘুরছে। একবার উঠছে আর একবার নামছে। জন্ম নিচ্ছে আর মারা যাচ্ছে।

কঠোপনিষদের ঋষি ওই একই কথাটাই বললেন, 'সমস্ত প্রাণীই দেখ না কেমন শস্যের মতোই মরে যাচ্ছে, আর শস্যের মতোই জন্মাচ্ছে।'

মৃত্যুর এই বোধগুলো জীবনে না এলে মৃত্যুকে বোঝা যাবে না কখনও। ব্রহ্মবিদ্যা, মোক্ষশাস্ত্র আমাদের মৃত্যুকে জানতে সাহায্য করে। মৃত্যুকে জানতে না পারলে জীবনটাকে কখনও ভালো করে জানাও যাবে না।

বটগাছের তলায় গুরু ও শিষ্যেরা বসে আছেন। আশপাশে শিষ্যেরা, তারা বৃদ্ধ, মাঝখানে বসে আছেন গুরু, তিনি যুবা। গুরু যুবক কারণ তিনি মৃত্যুকে জেনে ফেলেছেন। আর শিষ্যেরা বয়স্ক কারণ তাঁরা কেউই মৃত্যুর মহিমা বোঝেন না ভালো করে। গুরু চুপটি করে বসেই আছেন, মুখে কিছু বলছেন না, কিন্তু তাঁর প্রভাবে শিষ্যদের সব সংশয় দূর হয়ে যাচ্ছে। এক সাধারণ মানের শিষ্য বললেন, 'আপনি যে কিছুই বলছেন না, বুঝব কী করে?'

গুরুদেব মৃদু একটু হেসে বললেন, 'না বলাটাই বলা। গভীর কিছু, গূঢ় কিছু, আশ্চর্য কিছু, অলৌকিক কিছু, বিশেষ কিছু বুঝতে হলে তোমাকে হতে হবে ইঙ্গিতবাহী। সেই অধিকার তোমাকে লাভ করতে হবে।'

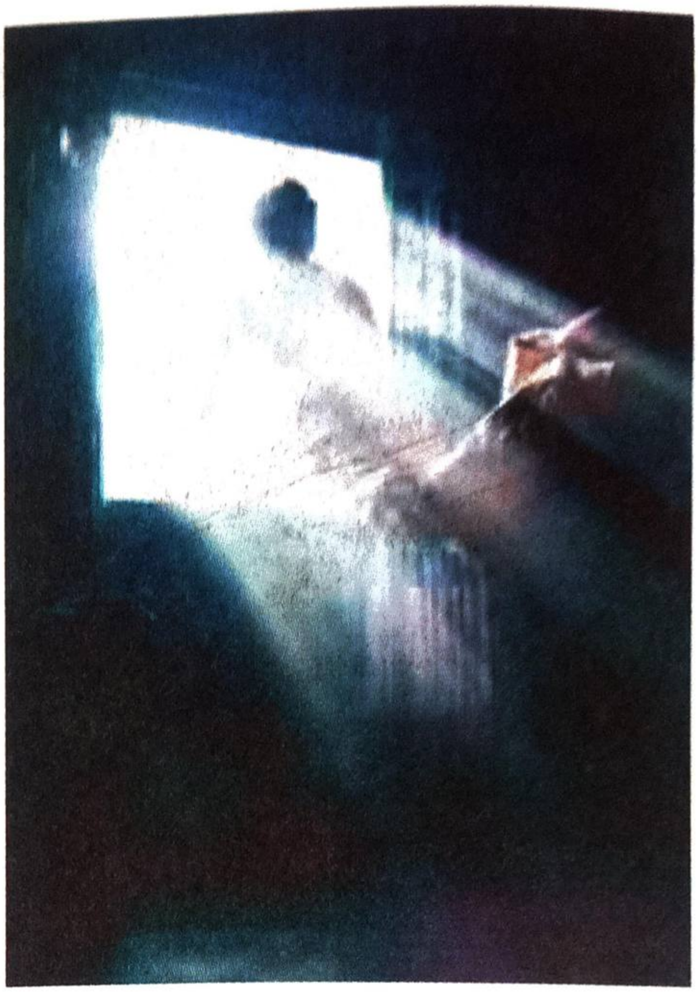

হেল্‌থ কেয়ার সেন্টার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

Breast Lump মানেই ক্যানসার নয় ঃ সঠিকভাবে জানুন

ব্রেস্ট লাম্প মানেই ক্যানসার এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার সময় এটা। লাম্প হলো এক ধরণের টিউমার বা ব্রেস্ট টিস্যুতে বৃদ্ধি। বিভিন্ন কারণে, যেমন, Hormonal কারণে, ফাইলয়েডস্ (Phyllodes) এর কারণে। Breast cyst এর কারণে, ফাইব্রোসিস্টিক (Fibrocystic) পরিবর্তনের কারণে, ফাইব্রোঅ্যাডিনোমা (Fibroadcnoma) র কারণে অথবা Masttis-এর কারণে ব্রেস্ট টিস্যুতে বৃদ্ধি পেয়ে ব্রেস্ট অথবা বগলের নীচে টিউমারের আকৃতি নেয়।

ব্রেস্ট লাম্প শুধুমাত্র মহিলাদের না, পুরুষদের ও হতে পারে স্থূলতা অথবা হরমোনজতি কারণে। যে কোনো ব্রেস্ট লাম্পের চিকিৎসার জন্য প্রথমেই কোনো Surgeon-এর কাছে যাওয়া উচিৎ। Clinical examination, egs Ultra-sound ম্যামোগ্রাফী /FNAC- র পরে সম্পূর্ণ Breast অপসারণ না করে Lumpectomy অথবা সার্জিক্যাল রিমুভাল অফ লাম্প করা হয়। এক্ষেত্রে Normal breast tissue- কে কোন ক্ষতি না করে, disfigurement না করে শুধুমাত্র টিউমার কে অপসারণ করা হয় এবং এর Routine biopsy করা হয়। প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন —

Dr. Ashutosh Nayak
M.S. F.MAS, MRCS-A (UK)
Trained in soft skill sury (UK)
General, Laparoscopic & Laser Surgery.

HEALTH CARE CENTER
88, Jessore Road,
Kolkata - 700028
Contact : 9073945866
drashutoshnayak.com

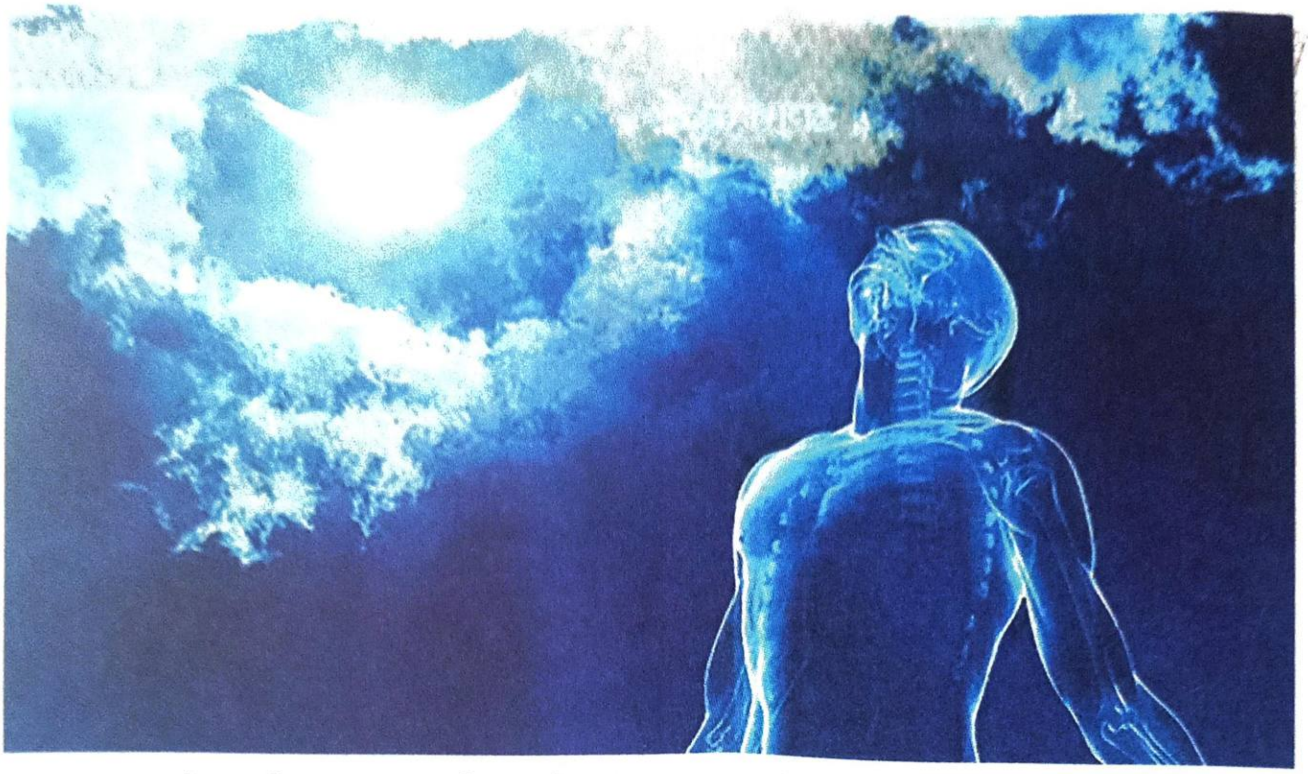

মৃত্যুও গুরুর এইভাবে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতির মতোই আমাদের মাঝেমধ্যে ইঙ্গিত দেয়। বুঝতে পারি না বলে আমরাও ওই গুরুর সাধারণ শিষ্যের মতোই বকবক করে চলি। 'বচনম্ অবচনম্'— বুদ্ধদেবেরও শিক্ষাপ্রণালী ছিল এইরকমই। কথা বললে রহস্যবিদ্যা আয়ত্ত করা যায় না, চুপ করে ইঙ্গিত বুঝতে পারলেই মৃত্যুরহস্য ধরা পড়বে আপনার মাঝে।

হাড়ের খাঁচা চামড়ার থলে

জন্ম আসলে কী? এটা তো জীবনের একটি পর্যায় মাত্র। জীবন তো ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ছুটে যাচ্ছে এবং ঋষিরা স্পষ্ট করেছেন আমাদের, সেটাই হল অমৃত। জীবনের একটি পর্যায় মৃত্যু, যেমন আমরা পুরনো বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে চলে যাই, পুরনো কাপড় ছেড়ে নতুন পোশাক পরি, তেমনই জীবনের একটি পর্যায়কে ছেড়ে পরবর্তী পর্যায়ে প্রবেশ করি মাত্র। মৃত্যুটা এর বাইরের কিছু না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বুদ্ধি ও বোধ সংসারের, জগতের অসাড় স্বরূপকে বুঝে নিতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অমৃতের স্বরূপকে বুঝতে পারে না, সুতরাং অমৃত স্বরূপে পরিণত হতে পারে না।

যমরাজ বললেন, 'দেহটা চলে যাওয়ার আগে যদি আত্মজ্ঞান লাভ হয় তবেই তুমি মুক্তি পাবে। নচেৎ ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞানতার জন্য ফের তোমাকে জন্ম নিয়ে এখন যেরকম ক্লেশ ভোগ করছ তেমনই পুনর্জন্মে ফিরেও ওই কষ্ট ভোগ করতেই হবে। এটা একটা চক্র। জন্ম-মৃত্যুর চক্রের বাইরে যদি বেরতে না জান কষ্ট, ক্লেশ, দুর্দশা থেকে তোমার কোনওভাবেই মুক্তি নেই।'

অর্হৎ যোগীরা দুঃখ নিবৃত্তির উপায়টা আমাদের বলে গিয়েছেন। জগতে দুঃখ আছে আর প্রত্যেক দুঃখের আগমন হচ্ছে রোজকার জীবনচর্চার নানান রকম কার্যকরণ থেকে। জাগতিক দুঃখ-যন্ত্রণা, জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির ঊর্ধ্বে ওঠার কথা বলেন অর্হৎ যোগীরা। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন অর্হৎ। অর্হৎ সাধনায় যাঁরা সিদ্ধ হন, তাঁরা যতদিন বেঁচে থাকেন, পরম আনন্দ ভোগ করে চলে যান। পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষজনদের কোনও জাগতিক অনুভূতি তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। অর্হৎ যোগীরা বলেন, 'বাসনা-তেল ভরা প্রদীপের মতো। যতক্ষণ প্রদীপদানিতে তেল রয়েছে জ্বলবে, তেমন যতক্ষণ চাওয়া-পাওয়া রয়েছে তোমার কারও না কারও কাছে, কোনও না কোনও কিছু থেকে ততক্ষণ সে সমস্ত পূরণ যদি না হয় দুঃখ-কষ্ট আপনে এসে হাজির হয়ে যাবে। দুঃখ আসার পথটা খালি বন্ধ করে দিও। বাসনাকে দেহ ধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী মেটাও, বেশি সুখ-ঐশ্বর্য ভোগ করতে চেও না, তাহলে দুঃখের পরিমাণ তোমার জীবন থেকে কমতে থাকবে আর তুমি অমৃতের পথে এগিয়ে চলে যাবে। পাঁচটা ইন্দ্রিয় আর মনের অভিব্যক্তি দিয়ে তোমার মধ্যে দুঃখ প্রবেশ করছে। মন ও ইন্দ্রিয়গুলোকে ঈশ্বরচিন্তাতে লাগাও, দেখ সেগুলোর উৎপাত আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

ব্রহ্ম কী? যাঁর ক্ষয় নেই, ক্ষরণ নেই, চলন নেই তাই হল অক্ষর। অক্ষরই হল ব্রহ্ম। গীতার মধ্যে অক্ষরব্রহ্মযোগ অধ্যায়টিতে এর সুন্দর ব্যাখ্যা রয়েছে।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যর কাছে তাঁর স্ত্রী গার্গী প্রশ্ন করলেন, 'ব্রহ্ম কী?'

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'তিনি স্থূল না, সূক্ষ্মও না, বেঁটেও না, লম্বাও নন, তিনি আগুনে পুড়ে যান না, জলে মিশে যান না। তাঁর কোনও ছায়া পড়ে না। তিনি বায়ু, আকাশ— এর কোনওটাই নন, তাঁর কোনও আকৃতি নেই। তিনি কিছুই খানদান না, কারও কর্তৃত্ব ভোগ করেন না। তিনি নির্গুণ। মায়ায় জড়িয়ে গিয়ে তিনি সগুণ হয়ে যায় বলেই তপস্বীদের স্বরূপে তাঁর আবার দেখাও মেলে।'

মানুষ দু'ধরনের— ক্ষর ও অক্ষর। আবার কর্মাশ্রয়ী ও মায়াশ্রয়ী। এই দুটো গুণ যখন শরীরে বর্তায় না তখনই তা ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়। ব্রহ্মের কাছাকাছি যাওয়ার একমাত্র পথ প্রাণবায়ু— যার সাহায্যে আমরা বেঁচেবর্তে থাকি তাকে মহা সমীরণে মিলিত করে দেওয়া। দেহের মধ্যে থাকে পঞ্চভূত। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম— এই পাঁচটা ভূত এক হয়েই শরীরটার জন্ম হয়েছে। যখন প্রাণবায়ুটা বেরিয়ে চলে যাবে, দেহটাকে ওই পঞ্চভূতের মধ্যেই মিলিয়ে দেওয়ার

এইচ পি ঘোষ হাসপাতাল দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত

বাঙালির ঘরে ঘরে লিভারের অসুখ কেন?

HP Ghosh Hospital
A Multispeciality Hospital

লিখেছেন এইচ পি ঘোষ হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট ডাঃ অগ্নিভ দত্ত।

লিভারের অসুখ বলতে আমরা ভাবি জন্ডিস, খিদে কমে যাওয়া, ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি। অথচ বাস্তবে বেশিরভাগ সময়েই লিভারের রোগে সেভাবে কোনও উপসর্গ দেখা যায় না। নিঃশব্দে ভয়াল রূপ ধারণ করে অসুখটি। সবচাইতে বড় কথা হল, লিভারের বড় সমস্যাটির নাম হল ফ্যাটি লিভার। গোপনে অসুখটি দেশের এক বৃহৎ অংশের মানুষের মধ্যে ডালপালা বিস্তার করছে। জানলে অবাক হবেন, ভারতের এক তৃতীয়াংশ মানুষ ফ্যাটি লিভার বা লিভারে অতিরিক্ত চর্বি জমার সমস্যায় ভোগেন। মূলত দু'টি কারণে আমরা ফ্যাটি লিভারের সমস্যা বেশি দেখতে পাই। প্রথমটি হল, মদ্যপান জনিত ফ্যাটি লিভার বা অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার। দ্বিতীয়টি হল মদ্যপানের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন ফ্যাটি লিভার বা নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার।

অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার :

স্টেটোটিক লিভার হল সবচেয়ে সাধারণ অ্যালকোহল-প্ররোচিত লিভার সমস্যা। লিভার কোষের ভিতরে চর্বি জমা হওয়া। এটি একটি বর্ধিত লিভারের দিকে পরিচালিত করে। এছাড়া অ্যালকোহল-সম্পর্কিত হেপাটাইটিসের জন্য লিভার কোষের মৃত্যু হয়। এছাড়া সিরোসিস হল লিভারের স্বাভাবিক টিস্যু ধ্বংস করা। এটি কার্যকরী লিভার টিস্যুর জায়গায় দাগ টিস্যু ছেড়ে দেয়। এ অবস্থায় লিভার সঠিকভাবে কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারে।

নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার :

অ্যালকোহলজনিত ফ্যাটি লিভারের সমস্যায় যত লোক ভোগেন, তার চাইতে অনেক বেশি করে লোকে ভোগেন নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভারে। আর তার মূল কারণ স্থূলত্ব। বিশেষ করে বর্তমান সময়ের মানুষ পশ্চিমী খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন, তৈলাক্ত চর্বিযুক্ত খাদ্য খাচ্ছেন। খাচ্ছেন বিপুল পরিমাণে কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্য। পাশাপাশি এক্সারসাইজের পাট নেই। এগুলির কুপ্রভাব পড়ছে শরীরে। ডায়াবেটিস রোগটিও নন - অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে। এছাড়া যাঁদের রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডস-এর মাত্রা বেশি থাকে এবং রক্তে ভালো কোলেস্টেরলের বা এইচডিএল এর মাত্রা কম থাকে তাঁদের নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। দেখা গিয়েছে, নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভারে আক্রান্তদের শুধুই কোলেস্টেরল বা সুগার নয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের আশঙ্কাও বেশি থাকে। অতএব ফ্যাটি লিভারের সমস্যা আছে মানে বুঝতে হবে ওই ব্যক্তির সার্বিকভাবে শারীরিক সুস্থতার দিকে নজর দেওয়া দরকার।

ছোটদের শারীরিক পরিস্থিতি :

আজকাল শিশুদেরও ফ্যাটি লিভারের সমস্যা আক্রান্ত হতে দেখা যাচ্ছে।
আর তার মূল কারণ খাদ্যাভ্যাস।

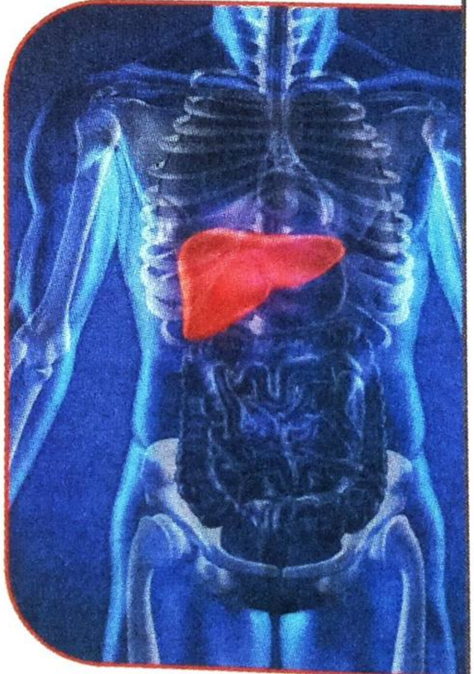

রোগ প্রতিরোধ :

যে কোনও তেলে ভাজা খাদ্য খাওয়া কমিয়ে ফেলুন। রান্নায় তেলের ব্যবহারও কমান। ঘি, মাখন এড়িয়ে চলুন। প্রিজারভেটিভ দেওয়া প্যাকেটজাত যে কোনও খাবার খাবেন না। বেশি মাত্রায় ময়দার খাদ্য, কার্বোহাইড্রেট রয়েছে এমন খাদ্য খাওয়া যাবে না। রেড মিট এড়িয়ে চলুন। প্রতিদিন ৩০-৩৫ মিনিট ঘাম ঝরিয়ে ব্যাম করতে হবে। তবেই সুস্থ থাকতে পারবেন।

কী খাবেন :

সবুজ ও রঙিন শাকসব্জি, ফল খান বেশি করে। মাছ খুব ভালো খাবার।

সংক্রমণ থেকে লিভারের অসুখ :

হেপাটাইটিস বি, সি-এর মতো ভাইরাসের সংক্রমণ লিভারের গুরুতর ক্ষতি করে। চিকিৎসা না হলে একসময়ে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যেতে পারে। তাই রোগ ধরা পড়লে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেতে হবে।

অন্যান্য কারণ :

বিরল হলেও অটোইমিউন হেপাটাইটিস হয় কারও কারও। এই ধরনের জটিলতাও তৈরি করতে পারে লিভারের রোগ।

www.hpghoshhospital.com
HB 36/A/2, Salt Lake, Sector - III, P.S. : Bidhannagar South, Kolkata - 700106
033 6634-6634
For Appointment, call: +91 9147065101

প্রক্রিয়াদি শুরু করবে স্বজনেরা। শরীরটা আমরা কত সুন্দর করে সাজিয়ে রাখি। ভালো জামাকাপড়, ভালো প্রসাধন— মুখ, চুল, গলায় বার্ধক্য আসতে দিই না, মেকআপ করি, চুলে কত ধরনের কী লাগাই। শরীরটাকে 'আমি' মনে করি বলেই তো এত কিছু করে তাকে তার সঠিক বয়স থেকে গোপন করে রাখি। আর সাধকেরা শরীরটাকে বলেন, 'হাড়ের খাঁচা ও চামড়ার থলিয়া।' সাপের গায়ে থাকে খোলস— সর্প কুঞ্চকের মতো মহাত্মারা এই খোলস ছেড়ে দিয়েই জীবমুক্ত হয়ে যান। আমরা পারি না বলেই খোলসটার যত্ন করি। দামি দামি পোশাকে, সাজানোর জিনিসপত্রে। অঙ্গের প্রতি আমাদের মায়া থাকে বলেই আমরা অঙ্গসজ্জার পেছনে রোজগারের টাকা ঢেলে দিই। এত কিছু করেও কি শরীরে বয়সের ছাপটা আটকাতে পারি? শরীরের এগুলো স্বাভাবিক নিয়ম— চুলে পাক ধরা, চামড়া কুঁচকে যাওয়া, চোখ-দাঁত খারাপ হওয়া। কিন্তু এই স্বাভাবিক নিয়মটাই আমরা চট করে মানতে পারি না। আমরা মৃত্যুকে মানবটা কী করে? শরীরের চামড়া-হাড়ে আটকে আছে আমাদের মন, দেহটার সুখ নিয়ে সর্বক্ষণ আমরা ব্যস্ত ও নাজেহাল, দেহটা অজ্ঞান, দেহটা স্বপ্ন— জ্ঞান হলে আর স্বপ্ন ভাঙলে পরেই আমরা স্ব-স্বরূপে চলে যাব, জীবমুক্তি ঘটবে আমাদের। তখনই মনে হবে মৃত্যুটা হল অমৃতের পথ। তার আগে পর্যন্ত মৃত্যুকে আড়াল করে আমরা দ্বেষ-বিদ্বেষ

নিয়ে মাতামাতি করব, ভাগাভাগি করব আমার তোমার, লড়াই করব খুব। একদিন লড়তে লড়তে টুক করে চলে যাব পৃথিবী থেকে। সাধের ঘরবাড়ি সব পড়ে থাকবে। প্রাণবায়ু শরীর থেকে বেরনোর পরপরই ওটা আর শরীর থাকবে না। হয়ে যাবে মৃতদেহ। ওই দেহ পঞ্চভূতে বিলীন করবার জন্যই স্বজনেরা তখন তৎপর হয়ে উঠবেন। মৃত্যু তাঁদের কাছে অমৃতের যাত্রা নয়, মৃত্যু হল মৃত ব্যক্তির ফেলে যাওয়া সম্পদে দখলদারিত্ব। মৃত্যু সব কিছু নষ্ট করে দিচ্ছে যেন। তাই অশৌচ পালন। শ্রাদ্ধ-শান্তি করে মৃত ব্যক্তির আত্মার তৃপ্তি দিয়ে তাঁর সম্পদটার অধিকারবোধ নিয়েই ঝগড়া বিবাদ। কিন্তু বিবাদ-কলহের সময় এটা আমরা কেউই ভাবি না কিন্তু— একদিন আমার পরিণতিটাও এইরকম হবে। মৃত্যু কখন আসবে— এটা বুঝব তবে আমরা কী করে, কীভাবে? মৃত্যুকে বোঝার একমাত্র রাস্তা অভ্যাসযোগ। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়েই এ যোগের কথা থাকলেও সবচেয়ে বেশি করে আছে অষ্টম অধ্যায়ে। মানুষ চলে গেলে তাই শ্রাদ্ধবাসরে গীতার অষ্টম অধ্যায়টিই পড়বার নিয়ম আর শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত পড়তে হয় কঠোপনিষদ ও গরুড়পুরাণ।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, 'তোমার মনে একই প্রকার ভাবনার প্রবাহ রোজ যদি তুমি প্রবাহিত করাতে জানো সেটাই হল অভ্যাস। মনটাকে একটা স্রোতের মধ্যে রাখতে হবে। তোমার দুই ভ্রুর মধ্যিখানে মনটাকে রাখ, উঁচু মনে হলে হৃদয়ে মনটা রাখ— ওখানে স্থির করে তাকে ধ্যান করতে থাক। তাহলেই দেখবে একটা নতুন প্রাণশক্তি তোমার শরীরে মৃদুভাবে বইতে শুরু করে দিয়েছে। এইভাবে প্রাণবায়ুকে ভ্রূ মধ্যে বা হৃদয়ে কিছুটা সময় আটকে ধরবার চেষ্টাটা করে যাও তুমি। এই অভ্যাস যদি থাকে তাহলে মৃত্যুর সময় একইভাবে স্থিরচিত্তে চলে যেতে তুমি পারবে। ওটাই অমৃতের পথে যাওয়া। না হলে রোগের কষ্ট নিয়ে, সংসারের অশান্তি, অপ্রাপ্তি আর আসক্তি নিয়ে— নানান ধরনের খেদ-দুঃখ নিয়ে তুমি চলে যাবে, ফের এখানে এসে ওই একই ফল ভোগ করতে থাকবে। প্রাণবায়ুকে স্থির কর, অর্জুন। মৃত্যুর সময় বায়ুকে যদি আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করাতে জান তাহলে কালের চক্র, জন্ম-মৃত্যুর সাধনায় জয়ী হয়ে যাবে তুমি। মনে রেখ বিনা সাধনায় মৃত্যু জয় করা যায় না, মৃত্যুর আগের মুহূর্ত, আসন্ন মৃত্যুর কালও ধরা পড়ে না কখনও।'

অর্জুন বললেন, 'কেমন সেই সাধনা?'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'একজন গুরু দরকার সবার আগে। তিনি বুঝিয়ে দেবেন তোমার মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ি কীভাবে রয়েছে। মাঝখানে আসে সুষুম্না, ইড়া বামে, ডানে পিঙ্গলা। সুষুম্নার মধ্যে বজ্রিণী বলে একটা নাড়ি আছে, ওর মধ্যে আরেক নাড়ি চিত্রিণী। চিত্রিণী নাড়ির ভেতর আছে ব্রহ্ম নাড়ি। মূলাধার পদ্ম থেকে সহস্রার পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে এই নাড়ি। তোমার কোমরের একেবারে শেষ প্রদেশ থেকে মাথা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে ব্রহ্ম নাড়ি। কোমরের নীচে, নাভির একটু নীচে, নাভিতে, হৃদয়ে, কণ্ঠে, দুই ভ্রুমধ্যে ও মস্তিষ্কের ওপর ঊর্ধ্বমুখীন দশার ভেতর রয়েছে সর্বমোট সাতটি গ্রন্থি— মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা চক্র ও সহস্রার— পদ্মের পাপড়ির মতো এগুলো সব আছে তোমার মেরুদণ্ডের ভেতর। সব মুখগুলো বুজে আছে। প্রাণবায়ুর শক্তির সাহায্য নিয়ে গুরুর শেখানো যোগে যদি মুখগুলোকে ওপরে তুলতে শেখ, তাহলে তোমার গোটা কুণ্ডলিনী চক্রটাই খুলে যাবে। 'তুমি শরীর' এই ভাবনা আগে দূর কর। ভাব তুমি সূক্ষ্মশক্তির আধার। দেখ এবার অভ্যাস করতে করতে ওই শক্তি তোমার মধ্যে ঢুকছে ক্রমশ। যখন দেহটা ছেড়ে দেওয়ার সময় হবে ওই শক্তি তোমার রোজকার অভ্যাসের জন্যে আপনিই আজ্ঞাচক্র ছাড়িয়ে সহস্রার প্রদেশ ডিঙিয়ে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ওপরকার বায়ুতে মিশে যাবে। ইন্দ্রিয় তোমাকে চালাচ্ছে, বায়ু যদি চালায় তাহলে একমাত্র মৃত্যুর আগের সময়টা তুমি ধরতে পারবে আর মৃত্যুর থেকে অমৃতের রাস্তাটা পেয়েও যাবে। না হলে মরবার আগে ভয়, হতাশা, দুঃখ, ব্যর্থতা, ক্লেশ সব এসে চেপে ধরে তোমার মায়ার দেহটাকে আটকে রাখবে। ভোগাবে বেশি। আসক্তি বেশি হলেই ভোগান্তি বেশি হবে। অভ্যাসযোগ কর আর অমৃতের যাত্রাপথটিকে প্রসারিত কর।'

যা অবশ্যম্ভাবী

জোসেফিন ম্যাকলাউড ১৮৯৫ সালে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি সবসময় নিজেকে স্বামীজির শিষ্য রূপে নয়, বরং বন্ধু রূপে পরিচয় দিতেন। তাঁর শরীর জীবনের শেষদিকে ভয়ঙ্করভাবে ভেঙে পড়েছিল। তিনি একাই থাকতেন,

সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতেন। মায়াবতী ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। মৃত্যুর চারদিন আগে ম্যাকলাউডকে হলিউড বেদান্ত সোসাইটি অব সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়াতে এনে রাখা হয়েছিল। তাঁর শরীরে মৃত্যুর যবনিকা যত নেমে আসছিল, তত তিনি উজ্জীবিত ও প্রাণবন্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'কোনওরকম একটা জরাজীর্ণ রোগগ্রস্ত শরীর আঁকড়ে থাকাটা কোনও কাজের কথা নয়, বরং সবসময় প্রস্তুত থাকাটাই আসল কথা। যিনি নিত্য, তিনি তো আমাদের মধ্যেই আছেন। তোমরা কি জানো না তোমরা ঈশ্বরের পুত্র?— এই কথাটাই চিন্তা করতে হবে, আমি তো তা-ই করি। লোকে বলে, মৃত্যু নিয়ে কথা বল কেন?— এমনভাবে কথাগুলি বলে যেন মৃত্যু যখন আসে তখন তা আশীর্বাদ নয়, যেন অভিশাপের মতো আসে! যা অবশ্যম্ভাবী তাকে চিনতে, মেনে নিতে এত দ্বিধা কেন? আমার মৃত্যু মুহূর্তে আমি তো পরিবার পরিজন থেকে দূরে থাকতে চাইব কারণ মৃত্যু এক অসাধারণ, অনবদ্য অভিজ্ঞতা— মৃত্যু মুহূর্তের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস, মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমাণ মানুষের নিবিড় পর্যবেক্ষণের বিষয়— তোমাদের কি তা-ই মনে হয় না?'

স্বামী তুরীয়ানন্দ ছিলেন এমন এক উচ্চকোটির যোগীপুরুষ, যিনি ইচ্ছামাত্র, মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে শরীর, মন এবং পারিপার্শ্বিকতার ঊর্ধ্বে তুলে নিয়ে যেতে পারতেন। শরীরে

অস্ত্রোপচার করার সময় তাঁকে অজ্ঞান করবার দরকার পর্যন্ত হতো না। তিনি সেটা চাইতেনও না। ডাক্তারকে শুধু বলতে হতো কখন কাজটি শুরু করবেন। সেই সময় তিনি নিজেকে শরীর, মন ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে ঊর্ধ্বে তুলে রাখতেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে চিকিৎসকেরা পর্যন্ত অবাক হয়ে যেতেন। শেষ জীবনটাতে তিনি স্নায়ুর নানান সমস্যাতে ভুগছিলেন। আমেরিকা থেকে এ কারণেই তাঁকে ভারতে ফিরে আসতে হয়েছিল। তাঁর মহাসমাধির ইঙ্গিত তিনি আগেই দিয়েছিলেন কিন্তু সেবকেরা কেউ তা বুঝতে পারেননি।

মহাসমাধির আগের রাতে স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন, 'শেষ দিন, শেষ দিন।'

বেনারসে স্বামী অখণ্ডানন্দজি তাঁকে দেখতে গেলে বললেন, 'সুপ্রভাত, সুপ্রভাত।' তিনি সাধারণত এরকম বলতেন না। একটু পরে থেকে থেকে তিনি বললেন, 'আমরা মায়ের, মা আমাদের, এটা বারবার বল, বারবার বল।' সন্ধ্যার দিকে বললেন, 'তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। মানুষ জানুক, আর নাই জানুক তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে।' এসময় তাঁর গলার আওয়াজ অস্বাভাবিক রকমের কোমল ও স্নেহসিক্ত হয়ে উঠল। তিনি সেবককে বললেন, 'সনৎ, আমার ব্যান্ডেজ খুলে দাও। এসব কী?'

তারপর ব্যান্ডেজ খুলে দেওয়া হলে বললেন, 'বাঃ! খুব ভালো হয়েছে। খুব ভালো করলে। আমাকে যেতে দাও, তুমি যদি যাওয়ার অনুমতি দাও, আমি দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হতে পারি।' তারপরই ধ্যানাসনে উঠে বসবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বললেন, 'শরীর যাচ্ছে, প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, আমার পা-দুটো সোজা করে দাও, আমার কপালের কাছে হাতদুটো অঞ্জলিবদ্ধ করে দাও।'

এরকম করে দেওয়া হতেই তুরীয়ানন্দ বললেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য, সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত।' ব্যস। তারপরই মহাসমাধিতে প্রবেশ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দ। এ সময়ে তাঁর মুখমণ্ডলে যন্ত্রণা বা বিরক্তির চিহ্ন ছিল না, বরং তা এক স্বর্গীয় আভায় জ্বলজ্বল করছিল।

পণ্ডিচেরী আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দের অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটজনক হচ্ছিল। মহানির্বাণের দশ মিনিট আগে হঠাৎ শ্রীঅরবিন্দ শিষ্যের নাম ধরে ডেকে উঠলেন, 'নীরদ, আমাকে পানীয় কিছু একটা দাও!'

ফলের রস একটু দেওয়া হতেই শ্রীঅরবিন্দ অতি সামান্যই পান করলেন। তারপর আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। তখন ঠিক রাত ১টা ২৬। ভোরবেলা দেখা গেল এক অপরূপ অবিশ্বাস্য দৃশ্য। তাঁর সারা দেহখানি সোনালি আভায় উদ্ভাসিত।

পণ্ডিচেরীর শ্রীমা সোনালি আলোর দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'যদি এই অতিমানস আলো স্থায়ী হয়, আমরা এই দেহ কাচের আধারে রেখে দেব।'

চার দিন শ্রীঅরবিন্দের দেহ ঘিরেই ছিল ওই সোনালি আলোর বলয়। পঞ্চম দিন ৯ ডিসেম্বর বিকেলে দেহ থেকে আলো সরে যেতেই তাঁকে পণ্ডিচেরী আশ্রমে সমাধিস্থ করা হল।

১২ ডিসেম্বর শ্রীমা এক অতুলনীয় হাসি হেসে আশ্রমের সাধকদের উদ্দেশে বললেন, 'কিছুই বদলায়নি। প্রেরণা ও সাহায্যের জন্য ডাক দাও, যেমন বরাবর করেছ, আগের মতোই তাঁর কাছে সব পাবে।'

শ্রীমা দেহ ছেড়ে দেওয়ার পর ওই একই রকম ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর দেহ ঘিরে নীল আলোর বলয় তিনদিন ছিল। চতুর্থ দিনে শ্রীমাকে সমাধিস্থ করা হয়।

মা আনন্দময়ী যখন দেহ ছাড়েন তখন ওই একই ধরনের সাদা আলোর বলয় উদ্ভাসিত করে রাখে তাঁর দেহটিকে।

১৯৫২ সালের ৭ মার্চ ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেসে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিনয়রঞ্জন সেনের সম্মানে আয়োজিত ভোজসভাতে উপস্থিত হয়েছিলেন যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর প্রশিষ্য পরমহংস যোগানন্দ। তখন এক আলোকচিত্রী যোগানন্দজির প্রেমপূর্ণ স্মিত হাসির একখানি ছবি তুলেছিলেন। এর এক ঘণ্টা পরই যোগীরাজ দেহ ছেড়ে দেন। তাঁর দেহ ঘিরে ওই স্মিতহাস্যের বলয় কুড়ি দিন পর্যন্ত কার্যকরী ছিল।

দেহে কোনও ধরনের বিঘটন দৃষ্ট হয়নি, তাঁর চামড়ার ওপর ছত্রাকের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়নি। দেহপেশির কোনও শুষ্কতাও দৃশ্যত ঘটেনি। ২৭ মার্চ পর্যন্ত যোগানন্দজির দেহ একইরূপ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ছিল।

যোগানন্দজি তাঁর গুরুদেব যুক্তেশ্বর গিরিজির দেহ পুরী আশ্রম বাগানের মধ্যে সাধুসন্ন্যাসীদের প্রাচীন শাস্ত্রবিধি

অনুসারে সমাধিস্থ করেছিলেন।

মাউন্ট ওয়াশিংটনে একদিন ধ্যানে বসছেন যোগানন্দ। হঠাৎ তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে যুক্তেশ্বর গিরির স্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল, 'ভারতবর্ষে ফিরে এসো, তোমার জন্য আমি পনেরো বছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে বসে আছি। শীঘ্রই আমি দেহত্যাগ করে অনন্তের দিকে পাড়ি জমাব। যোগানন্দ, চলে এস!'

চোখের পলকে দশ হাজার মাইল অতিক্রম করে গুরুদেবের আহ্বান যোগানন্দজির অন্তরে এসে পৌঁছল— বিদ্যুৎচমকের মতো। যোগানন্দ পাশ্চাত্য দেশে এসেছিলেন ১৯২০ সালে। পনেরো বছর ধরে তিনি গুরুর শিক্ষা আমেরিকায় প্রচার করে এসেছেন। এখন গুরু তাঁকে ডাক দিলেন।

শ্রীরামপুর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন যোগানন্দ, কিছু গোলাপফুল আর ফলমূল নিয়ে। ১৯৩৫ সালে প্রয়াগে চলছে কুম্ভমেলা। যোগানন্দ সেখানে যাবেন বলে গুরুর অনুমতি চাইলেন। গুরুদেবের চক্ষু দু'টি স্থির, স্নিগ্ধ। শান্তভাবে বললেন, 'পৃথিবীতে আমার কাজ ফুরিয়েছে, তোমাকেই এখন থেকে সব চালাতে হবে।'

শুনে ভয়ে যোগানন্দজির বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। যুক্তেশ্বর গিরি বললেন, 'পুরীতে আমাদের আশ্রমের ভার নেওয়ার জন্য কাউকে পাঠিয়ে দিও। তোমার হাতে আমি সবই দিয়ে যাচ্ছি। তুমি তোমার জীবন আর এই প্রতিষ্ঠানের তরী,

ঠিকই সাফল্যের সঙ্গে স্বর্গের বেলাভূমিতে ভিড়োতে পারবে।'

অশ্রুপ্লাবিত নয়নে যোগানন্দ গুরুদেবের পা দু'টি জড়িয়ে আশীর্বাদ নিয়ে চলে গেলেন কুম্ভে। ফেরার পর শ্রীরামপুর আশ্রম এসে শুনলেন গুরুদেব গিয়েছেন পুরীতে। পরদিন সন্ধেবেলা ট্রেন ধরার জন্য যাত্রা করলেন। তখন প্রায় সাতটা বাজে।

একটা ঘন কৃষ্ণবর্ণ সূক্ষ্ম মেঘ হঠাৎ কোথা থেকে এসে আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলল। ট্রেন পুরীর দিকে ছুটে চলেছে, যুক্তেশ্বর গিরিজির মূর্তি হঠাৎ যোগানন্দজির সম্মুখে এসে আবির্ভূত হল। মূর্তিটি তাঁর কাছে এসে বসল। অত্যন্ত গম্ভীর মূর্তি। মূর্তির দু'ধারে আলো।

করজোড়ে অনুনয় করে যোগানন্দ বললেন, 'সব কি শেষ হয়ে গেছে?' গুরুদেব একটু মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পরদিন সকালে পুরী প্ল্যাটফর্মে এসে নামলেন যোগানন্দ। মনে তখনও ক্ষীণতম আশা। এমন সময় একজন অপরিচিত লোক তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'আপনার গুরুদেব দেহরক্ষা করেছেন।' বলেই লোকটা চলে গেল।

যোগানন্দজির শরীর অস্থির অস্থির করতে থাকল। অজ্ঞান হওয়ার মতো যখন অবস্থা তখনই তিনি নিজের মধ্যে গুরুদেবের স্বর শুনতে পেলেন, 'শান্ত হও, স্থির হও।'

আশ্রমে পৌঁছে যোগানন্দ শুনলেন গতকাল সন্ধ্যা সাতটার সময় যুক্তেশ্বর গিরি দেহ রেখেছেন। যোগানন্দজির সামনে গুরুদেব কাল আবির্ভূত হয়েছিলেন ওই একই সময়ে!

পরমহংস যোগানন্দ ১৯৩৬ সালে তাঁর গুরুর দর্শন পান বোম্বাইয়ে রিজেন্ট হোটেলে। তিনতলা ঘরে হঠাৎ জ্যোতি এসে ভরে যায়। জ্যোতি থেকে বেরিয়ে আসেন রক্তমাংসের শরীরে যুক্তেশ্বর গিরিজি।

যোগানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, 'পুরীতে আপনার দেহ আমি নিজে হাতে সমাধি দিয়েছিলাম। আপনি কি তেমনই দেহ ধারণ করে এলেন?'

যুক্তেশ্বর গিরি বললেন, 'এটা রক্তমাংসের শরীর হলেও আমার চোখে সূক্ষ্ম। তুমি আমার জড়দেহের সমাধি দিয়েছিলে। ঠিক তারই মতো একটি সম্পূর্ণ নতুন দেহ আমি মহাব্যোম থেকে সৃষ্টি করে তোমার কাছে এসেছি।'

যোগানন্দ গুরুদেবকে প্রণাম করে আলিঙ্গন করে বুঝলেন, তাঁর গা থেকে আগের মতো মৃদু একটা সুরভী বের হচ্ছে। শ্রীরামপুর আশ্রমে থাকাকালীন পুরনো কথা সব মনে পড়ে যাচ্ছে শিষ্য যোগানন্দের।

যুক্তেশ্বর গিরি বললেন, 'জড় জগতে মানুষের কর্মক্ষয়ে সাহায্য করতে যেমন মহাপুরুষেরা প্রেরিত হন আমিও তেমনই এক সূক্ষ্মজগতের মুক্তিদাতারূপে কাজ করতে ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি। যেখান থেকে আমি এসেছি তার নাম হিরণ্যলোক। সেখানে উচ্চস্তরের জীবাত্মারা সূক্ষ্মদেহে থাকেন। মৃত্যুর সময় যাঁরা সমাধিমগ্ন হয়ে দেহ ছেড়ে দেন তাঁরাই ওখানে থাকেন। সূক্ষ্মজগতে বহু আত্মীক বাস করেন। তাঁরা আলোকপিণ্ডের সাহায্যে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ঘুরে বেড়ান। সেখানে পৃথিবীর মতো জলবায়ু, ঋতু নেই। সাধারণ সূক্ষ্মলোক হল পরলোক। সেখানে শুভ আত্মারা সব বিচরণ করেন। দুষ্ট আত্মাদের গতিবিধি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে থেমে যায়। পরলোকে যেতে পারে না তারা। প্রেতলোকে থাকে তারা। সূক্ষ্ম জগতের সবকিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছায় আর কিছুটা আত্মীকদের ইচ্ছার আহ্বানে প্রকাশিত হয়।'

মৃত্যুর আগের পরিবর্তন

মহাত্মারা বলছেন, 'মানুষের মৃত্যু একটা আবৃত্তি।' একটা জিনিসের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়াটাই হল আবৃত্তি। চক্রের মতো মানুষের মনটারও ওই একইরকমের গতি। মানুষের মনও একটা আবৃত্তি। মনের ঘোরাফেরাটাকেও যোগীরা বলছেন, মৃত্যু। মৃত্যুর দুটো শক্তি থাকে। একটা শক্তি সবাইকে সে আবর্তিত করছে, ঘুরিয়ে মারছে। মৃত্যু থেকে জন্ম, জন্ম থেকে মৃত্যু। এই ঘুরে চলাটিকে উপনিষদের ঋষিরা বলছেন, মর্তশক্তি। সাধারণ মানুষেরা মৃত্যুর এই ভয়ঙ্কর শক্তির বলেই কেবল আসা-যাওয়া করছে পৃথিবীতে, আর দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করে মরছে। মৃত্যুর আরেকটা শক্তি রয়েছে তাকে ঋষিরা বলছেন, মরশক্তি— মরুৎশক্তি। এই শক্তিটা আমাদের আবর্তনের ওপারে নিয়ে চলে যায়। সেখানে মৃত্যু জ্যোতিস্বরূপ হয়ে ওঠে। লৌকিকভূমি পার করে তপস্বীরা, যোগীরা চলে যান আর ব্যবহারিক ভূমি এই পৃথিবীতে সাধারণ ভোগবাদী মানুষরা ফিরে-ফিরে আসে।

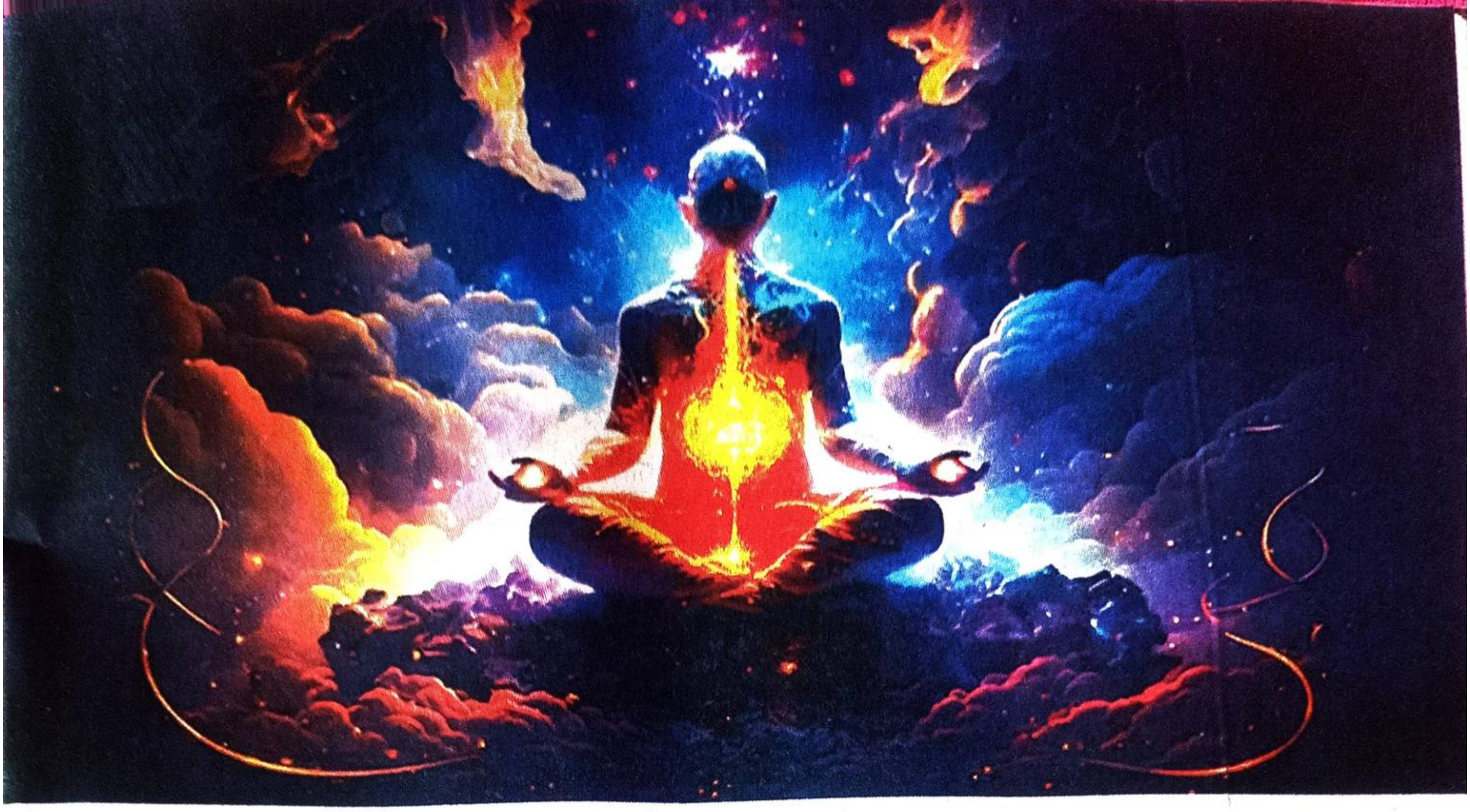

আমরা বিশ্বাস করি জীব মাত্রেই পুনর্জন্ম হয়, মানুষ মাত্রেই পুনর্জন্ম হয়। আমাদের এহেন বিশ্বাসকে সমর্থন দেননি কিন্তু উপনিষদের ঋষিরা। তাঁরা বলেছেন, মৃত্যুর পর মানুষের তিন ধরনের গতি হয়। যে সমস্ত মানুষের চেতনা ঊর্ধ্বমুখী থাকে, ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আবার ফিরে চলে আসে পৃথিবীতে। আবর্তগতি। ফিরে ফিরে আসা। এটা পিতৃযানের পথ। সাধারণ মানুষের এই ধরনের গতি হয়। আর যাঁদের চেতনা একেবারে ঊর্ধ্বে উঠে যায়, পৃথিবীতে আর ফিরে আসে না— ঊর্ধ্বলোক থেকে আরও ঊর্ধ্বলোকে উঠে যায়, তাঁদের হয় দেবযানের উৎক্রান্তি। এই ধরনের মৃত্যু হয় সাধু-মহাত্মা, যোগী-তপস্বীদের। আর একটা তৃতীয় ভূমি রয়েছে— যেখান থেকেও মানুষের পুনর্জন্ম হয়, এখানকার মানুষেরা জন্মাচ্ছে আবার মরে যাচ্ছে— তাদের না হচ্ছে সংসারগতি না ঊর্ধ্বগতি।

অনেক মানুষের চেতনা থাকে খুব নীচের স্তরে। ঊর্ধ্বে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাদের থাকেও না। এদের পুনর্জন্ম নাও হতে পারে। গাছেতে অজস্র ফুল ধরে, প্রত্যেক ফুলেরই ফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু আমরা দেখি যে কিছু ফুল ঝরে যায়। আর যা ফল হয়, সবগুলো পাকে না। ঋষিরা বললেন, ‘সমস্ত জীবজন্তু, মানুষ— ভূতবর্গের মধ্যে এরকম ব্যাপারও ঘটে। সবার যে জন্মান্তর হবে এরকম মনে করবারও কোনও কারণ নেই। জন্মান্তর তাদেরই হয় যারা একদিন পাকবে ওই ফলের মতো।’

বাসনা যাদের প্রবল তাদের ফিরে আসতেই হবে। এটাই ভবিতব্য। যাদের বাসনা এ জন্মে না মেটে তাদের ফেরার সম্ভাবনা অত্যধিক। কোন ধরনের মানুষ ফিরবে তার একটা সূত্র দিয়েছেন পৌরাণিক ঋষিরা। তাঁরা বলছেন, ‘মৃত্যু যখন মানুষের কাছাকাছি আসতে থাকে তার ছায়া তাকে ছেড়ে চলে যায়। তেলে, জলে নিজের ছায়া দেখা যায় না। মৃত্যুর আগে যে মানুষদের জীবনে এরকম ঘটনা ঘটে তারা ফিরবে। একটা একাকিত্বের পরিবেশ যদি চলে যাওয়ার আগে কোনও মানুষের মধ্যে থেকে যায় তাহলে এরাও ফিরবে। অনেক মানুষের মৃত্যুর আগে গা থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ ওঠে— ফুল, ধূপ কোনও চেনা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধের সঙ্গে মিল থাকে না। এ হল আসক্তির গন্ধ। এরা চক্রাকারে পাক খাবেই। আয়নাতে নিজের ছায়া যখন বড় দেখা যায়, বিসদৃশ একটা অবয়ব ফুটে ওঠে, বুঝতে হবে মৃত্যু আসন্ন আর শরীর সর্বস্ব ভাবনার কারণে তাকে ফের এখানে আসতে হচ্ছেই। চোখের সামনে হঠাৎ চাঁদ দেখতে পাওয়া কিংবা একই আকাশে সূর্য-চন্দ্র একসঙ্গে দেখা— এই দৃষ্টিভ্রম ঘটলে বুঝতে হবে যে যাওয়ার যেমন সময় হল তেমনই মায়াসিক্ত দ্বৈত অনুমতির ফলস্বরূপ তাকে মায়া ঘেরা জগতে ফের এসে বাস করতে হবে। হঠাৎ কোনও মানুষের গায়ের রং যদি লালচে, হলদে হয়ে যায় বুঝতে হবে মৃত্যু আসন্ন। জিভ, মুখ, নাক অসাড় হয়ে গেল, নিমেষে দৃষ্টি একেবারেই ক্ষীণ— কিছু দেখা যাচ্ছে না, তাকালেই নিজের মৃতদেহটা কেবল ফুটে উঠছে— এইরকম ঘটনাগুলো সব দেহবদ্ধতার কারণে ঘটে। দেহ ঘিরে যাদের বেশি ভাবনাচিন্তা থাকে, রোগ হলে উতলা হয় যারা, তাদের মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই এ সমস্ত ঘটতে থাকে। গরুড় পুরাণের ঋষিরা এইসব সংকেত আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছেন।

বেদের ঋষিরা পাঁচজন দেবতার কথা বলেছেন—

অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য ও মৃত্যু। শরীরটাই আমাদের পৃথিবী। পঞ্চভূতের একটা ক্ষিতি, এই ক্ষিতির মধ্যে রয়েছে অগ্নি দেবতা— ভূতাগ্নি, জঠরাগ্নি সব আগুন দেহের মধ্যে আছে। এই আগুনে খাবার দাবার যেমন পরিপাক হয় তেমনই সাধনা চলে। মণিপুর চক্রে থাকেন অগ্নি দেবতা। বায়ু দেবতা থাকেন হৃদয়ে— অনাহত চক্রে। ধ্যানে যে জ্যোতি দেখি তা বায়ু অন্তরিক্ষ তৈরি করে। এই হল দেহের আরেকটা ভূত। ধ্যানের ভেতর শুদ্ধ মনের যে জ্যোতি, তাই হল ইন্দ্র। ওই জ্যোতির ওপরে সূর্য। অখণ্ড চৈতন্যকে ঋষিরা বলছেন, সূর্য। সূর্যের ওপারে মৃত্যু, অন্ধকার। চেতনার একটা ভূমি থেকে আরেকটা ভূমিতে সাধনার মধ্যে দিয়ে যাঁরা চলে যান তাঁরাই মৃত্যুকে ভয় পান। মৃত্যু হল একটা অব্যক্ত তত্ত্ব। আমাদের শরীরের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি থাকে বলেই মৃত্যুর কথা শুনলেই আমরা ভয় পেয়ে যাই।

আমার সঙ্গে আজ থেকে বারো বছর আগে এক জ্ঞানসিদ্ধা মাতাজির সাক্ষাৎ হয়েছিল তারাপীঠের কাছে মদিয়ান গ্রামে। তিনি তখন এসেছিলেন কামাখ্যা থেকে। তাঁর এক গুরুবোন সঙ্গে ছিলেন। তিনি এসেছিলেন কাশী থেকে। মদিয়ানের কুঠিয়াতে যে রাতে আমরা ছিলাম, সেখানে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। মাতাজির গুরুবোন সে রাতে রাজহাঁসের ডিমের তরকারি খেতে চাইলেন। মাতাজি সে রাত্তিরেই তড়িঘড়ি তাঁকে রেঁধে খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আর মায়ের গুরুবোন উপস্থিত সাধুগুরুদের কাশী যাওয়ার নিয়ন্ত্রণ করলেন। গুরুবোনের জন্য রাজহাঁসের ডিমের তরকারি রাঁধতে রাঁধতে মাতাজি তাঁর গুরুভাই কাশীর সুমেরু মঠের সোমানন্দ অবধূত ঠাকুরকে বললেন, 'ডিমটা রান্না হলে যুক্তামুখীকে খাইয়ে দিতেই তুমি বাবা ওকে মল্লারপুর পাঠিয়ে দিও।'

অবধূত বললেন, 'এত রাতে কীভাবে যাবেন তিনি?'

মাতাজি বললেন, 'যেতেই হবে যে বাবা, আর ওই রাজহাঁসের ডিম না খেয়ে ও যদি চলে যায়, ফের আসতে হবে।'

অবধূত চমকে বলে উঠলেন, 'এর মানেটা কী মাতাজি?'

জ্ঞানসিদ্ধা মাঈ বললেন, 'আমার গুরুদেব ছিলেন প্রধাবন সাধু। যাঁরা উপস্থিত মৃত্যুর চিহ্ন শরীরে ধরতে পারেন তাঁদের বলে প্রধাবন সাধু। আমি এই বিদ্যা গুরুর কাছ থেকে রপ্ত করেছি। আজ দুপুরে আমি দেখেছি যুক্তামুখীর ছায়া প্রখর রোদের সময় বসে থাকলেও দাওয়াতে পড়েনি। মানুষের চলে যাওয়ার সময় হলে এই ঘটনা ঘটে। দেহের ছায়া যেদিন মরে যায় পরদিন সূর্য ওঠার আগে সে চলে যায়। আমার গুরু যদি সত্যি হন আর প্রাচীন ঋষিদের কাছ থেকে পাওয়া এই প্রধাবন বিদ্যা যদি সত্যি হয়, তাহলে কাল সকালের সূর্য ওঠার আগেই যুক্তামুখী পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করবে। মল্লারপুর শিববাড়িতে আজ থেকে তিনশো বছর আগে এক নাগা সাধু জীবন্ত সমাধি নিয়েছিলেন। তিনি সমাধি খুঁড়ে শিষ্যদের বলেছিলেন মাটি চাপা দিতে। সেই সাধু ছিলেন মাতৃসাধক রামপ্রসাদ সেনের তন্ত্রগুরু। ওখানে এখনও সূক্ষ্ম শরীরের অনেক মহাত্মারা রাত্তিরে আসেন। যুক্তামুখী ওখানে গেলেই ওঁর আত্মার সদগতি লাভ করবে।' সত্যি কথা বলতে কী, উপস্থিত সকলেরই তখন মাতাজির ভাবাবেশে বলা কথাগুলো কেমন যেন প্রলাপ মতো মনে হচ্ছিল। কিন্তু পরদিন সকাল হতেই যখন সত্যি সত্যি খবর এল মদিয়ানে— যুক্তামুখী মাতা মহাত্মা কৃষ্ণানন্দের জীবন্ত সমাধির বেদিতে ধ্যানরতা অবস্থাতেই দেহ ছেড়ে দিয়েছেন! তখনই সবার টনক নড়ে গেল। জ্ঞানসিদ্ধা মাতাজি কেবল বললেন, 'সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে।' আর কোনও কথাই বলতে পারলেন না। তাঁর সমাধি হয়ে গেল। এই ঘটনাটি আমার স্বচক্ষে দেখা। একশোর কাছাকাছি বয়স নিয়ে মাতাজি এখনও দেহে বর্তমান। মানুষের শরীর চলে যাওয়ার সময় কারা অগ্রিম কী কী অনুধাবন করতে পারবেন সে সম্পর্কে প্রধাবন সিদ্ধা মাতাজির কাছ থেকে যেটুকু আমি সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তাই এখানে সাজিয়ে দিলাম।

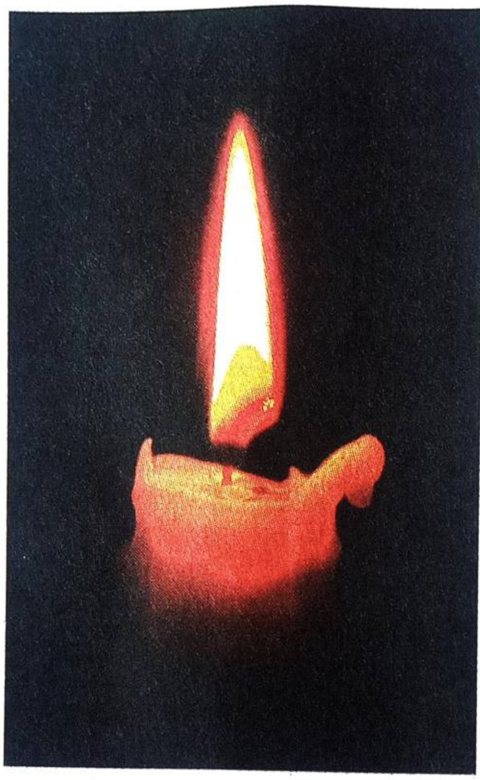

১. যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ভুগেই চলেছেন, একেবারেই বিছানাতে মিশে গিয়েছেন তাঁদের চেতনার ঊর্ধ্বমুখীন শক্তি একেবারেই নীচে নেমে যায় বলে এ ধরনের মানুষেরা চট করে যান না কখনও।

২. শরীরে যাঁদের অন্নময় চেতনা বেশি— সর্বক্ষণ জাগতিক চিন্তা নিয়েই আছেন, সারাটা ক্ষণ টাকা টাকা করে কাটাচ্ছেন, একে ঠকাচ্ছেন ওকে হেনস্তা করছেন, এ ধরনের মানুষের শরীরে হঠাৎ জড়ত্ব নেমে আসে। চেতনা হারিয়ে তাঁরা দীর্ঘকাল থাকেন আর শরীরের দুর্ভোগটা বুঝতেও পারেন না। এঁরা যখন চলে যান, তখন কিছুই যাওয়ার আগাম আভাস পান না।

৩. কিছু বিরল মানুষের শরীরে থাকে দেবচৈতন্য। তিন ধরনের চৈতন্য থাকে শরীরের মধ্যে— স্থূলচৈতন্য, সূক্ষ্মচৈতন্য আর দেবচৈতন্য। দেবচৈতন্যের অধিকারী যাঁরা মৃত্যুর আগাম সংকেত তাঁরা পান। মৃত্যুর আগে সমস্ত রকম জাগতিক দায়-দায়িত্ব পরবর্তী উত্তরসূরিদের হাতে অর্পণ করেই যান এঁরা। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেবচৈতন্যের অধিকারীগণ অন্তরাবৃত্ত হয়ে গিয়ে অপরের আত্মচৈতন্যকে পর্যন্ত দেখতে পান।

৪. দেহ, ইন্দ্রিয় ও সকল মানসক্রিয়া থেকে যাঁরা একেবারে মুক্ত, যাঁদের সুখ-দুঃখের বোধগুলো চলে যায়, যাঁরা নিজের শাশ্বত স্বভাবকে ধরতে জানেন তাঁরা মৃত্যুমুক্ত।

৫. চিরবিকারহীন আত্মসত্তার দিকে যাঁদের প্রবল মনোযোগ থাকে তাঁরা নিজেদেরকে দুঃখ-ক্লেশের ভোক্তা বলেই মনে করেন না বলে দেহ থেকে প্রয়োজনমতো মন তুলে নিতে পারেন। ইচ্ছামৃত্যু এঁদের একমাত্র হতে পারে। যেমন গঙ্গার পুত্র ভীষ্মের হয়েছিল।

৬. নাড়িমালা দেখে যে কোনও রোগী মৃত্যুজ্ঞান লাভ করতে পারেন। যদি রোগীর শরীর অতিশয় ক্ষীণ হয়ে যায়, চামড়ার বাইরে সমস্ত শিরা ফুটে উঠতে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে শরীরের মধ্যকার নাড়ি কেঁচো ও সাপের মতো পাতলা ও মসৃণ হয়ে বেঁকে বেঁকে গোটা দেহটাতে বইছে বলেই সেটা ক্ষীণশক্তির দিকে ক্রমশ এগচ্ছে। এই ধরনের শরীর হলে একমাসের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটবে।

৭. যদি কোনও মানুষের দিকভ্রম প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকে— উত্তর-দক্ষিণ ঠিক করতে পারেন না, তাহলে বুঝতে হবে যে তাঁর আয়ু কমে এসেছে।

৮. স্নান করার পরপর যদি হৃদয় প্রদেশ শুকনো-শুকনো লাগতে থাকে, ধোঁয়া-ধোঁয়া লাগে চোখ, অন্তত একমাস কাল যাবৎ যদি এই একই অনুভূতি আসে স্নানের পর তাহলে তাঁর মৃত্যুগ্রাসে পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

৯. কোনও মানুষের খুব খারাপ স্বভাব হঠাৎ যদি ভালো হয়ে যায় বুঝতে হবে যে তিনি আর বেশিদিন ইহজগতে নেই।

আমি ও আমি

আমরা আমাদের আমিটাকে নাড়াচাড়া করি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

পর্ব ॥ ৪৯ ॥

জীবন হল এক প্যাকেট সময়। রোজ একটু একটু খরচ। সময়ের মালিককে পাওনা, গণ্ডা সমেত ফিরিয়ে দিতে হবে। আর দশটা বছর পার করতে পারলেই সেঞ্চুরি। দেখেছি অনেক, শিখেছি কাঁচকলা। আত্মজীবনী আবার কী? আত্মকথা, অর্থাৎ আমার কথা। তেমন বড় কোনও 'আমি' হলে জমজমাট একটা কাহিনি হতো। ছোট্ট আমির যত তুচ্ছ কথা। একদিন চোখ মেলেছিল, একদিন চোখ বুজেছিল, অন্ধকার থেকে আলোয়, আলো থেকে অন্ধকার। শত শত জীবন অদৃশ্য কালিতে এক মহাজীবনের দিনলিপি লিখে চলেছে।

কী হল জানি না। একপ্রস্থ চা খাওয়ার পর বাবা আমাকে ডেকে বললেন, দক্ষিণে গানের ঘরে মাদুর বেছাও। আমার এস্রাজটা নামিয়ে আনো। আরতির বাবাকে বললেন, ছোট্ট একটা গানের আসর বসানো যাক, কী বলেন? মুখুজ্যেমশাইও এসে গিয়েছেন। মুখুজ্যেমশাই আমার দাদু। আরতির বাবার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, বা বা বা! এ তো দেখছি আমাদের প্রাচীন বাংলা প্রবাদের মতো হল। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। বাবা আমাকে বললেন, পাখিটাকে ধরে আনো। আর তোমার দাদুকে বল চলে আসতে। আসর সাজিয়ে দিয়ে মনে মনে ভাবছি, ও পাখিকে ধরা আমার সাধ্যে কুলোবে না। কারণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, মস্ত ডুমুর গাছটার দিকে মোহিত হয়ে তাকিয়ে আছে আরতি। আর রানিদিদিকে বারে বারে বলছে, আমি কিন্তু গাছে উঠতে পারি, আমি কিন্তু গাছে উঠতে পারি। আমি গলাটাকে বেশ একটু ভারী করে বললুম, বাবারা ডাকছেন। চলে এসো। দুই বাবা আর এক দাদু। আসর যদি জমে যায়, দুপুরের খাওয়া মাথায় উঠবে। আমাদের রবিবারের দুপুরের খাওয়াটা বেশ জমিয়ে হয়।

আসরে সবাই বসে পড়েছেন। বাবা যেমন বলেন, আমাকে বললেন, ইঁদুরের মতো ছুটোছুটি না করে হারমোনিয়ামে বসে একটু সুর দাও, এস্রাজটা বাঁধি। আরতি একটা আঙুল তুলে বাবাকে বেশ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস

করছে, এই ঝকঝকে যন্ত্রটায় আমি একটু আঙুল ঠেকাতে পারি? বাবা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি। কোনও উত্তর দিলেন না। আরতি আঙুলটা তুলে বসেই রয়েছে। দু-তিন মিনিটের মধ্যে এস্রাজ বাঁধা হয়ে গেল। বাবা আরতিকে বললেন, বাবু হয়ে বোসো। দু'হাত জোড়া করে আকাশের দিকে তুলে চোখ বুজিয়ে মা সরস্বতীকে নমস্কার কর। মেয়ে তো বেশ ঘাবড়ে গেছে। আমার খুব মজা লাগছে। আরতি হতভম্ব হয়ে বাবার নির্দেশ পালন করল। বুঝতে পারছে না, কী হবে। বাবা এস্রাজটা তার কোলে বসিয়ে বাঁ কাঁধে ঠেকিয়ে দিলেন। ডান হাতে ধরিয়ে দিলেন ছড়িটা। এবার যে তারে হাত দিতে হবে সেই তারে বাঁ হাতের আঙুলটা ঠেকিয়ে দিলেন। বললেন, ছড়িটা চালাও। খুব সাহসী মেয়ে, তাই না! হাত তো ভয়ে কাঁপছে। বাবা বলছেন, যে পর্দাটায় হাত দিয়েছ, সেটা সা। আমাকে বললেন, সা-টা টেপো। ছড়ি কোন দিক থেকে কোন দিকে টানতে হবে সে নির্দেশও দিলেন। বললেন, আলতো করে সা সুরটা বের কর দেখি। আরতি চোখ বুজিয়ে ছড়ি চালাল। প্রথম যে শব্দটা বেরল, মনে হল যেন সা-এর ব্রঙ্কাইটিস হয়েছে। বাবা বললেন, আমি কিছু বলব না, ঠিক ঠিক সুর বের কর। দু-চার বারের চেষ্টায় সা বেরল। এরপর বাবার নির্দেশ, চলে এসো রে-তে। পরের পর্দা। বেশ বুঝতে পারছি, আরতি খুব ফ্যাসাদে পড়েছে। তবে তার খুব চেষ্টা আছে। অল্প কয়েকবার করতে করতে ঠিক সুরে নিয়ে এসে ফেলছে। যখনই ঠিক সুর বেরচ্ছে, দাদু উচ্ছ্বসিত হয়ে আহা আহা করে উঠছেন। যেন মস্ত বড় কোনও ওস্তাদের বাজনা শুনছেন। বাবা একটু বিরক্ত ভাবেই দাদুকে বললেন, উৎসাহ দেওয়াটা ভালো। তবে আপনার গলাটা যদি একটু নামিয়ে রাখেন, তাহলে আমরা, যারা শ্রোতা, তাদের চমকে চমকে উঠতে হয় না। দাদু বাবার কথায় আমল না দিয়ে ভাবগম্ভীর মুখে বললেন, এ তো দেখছি একটা প্রতিভা! বাবা বললেন, তা বটে, সা থেকে রে-তে গিয়েছে, এতেই প্রতিভা। এখনও অনেকগুলো পর্দা আছে। মা আছে, পা আছে। তারপরও...। দাদু সংযত হয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ। সে ঠিক, সে ঠিক।

আধ ঘণ্টার চেষ্টায় আরতি ব্যাপারটাকে বেশ রপ্ত করে ফেলল। তারের ঘর্ষণে তার ফর্সা আঙুলের মাথাটা লাল হয়ে গিয়েছে। যেন একটা করমচা। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি ঘরের বাইরে দরজার পাশে রানিদিদি বসে আছে। মুখের চেহারাটা বেশ করুণ। সেই দিকে তাকিয়ে আমি তার মনের ভাবটা বুঝতে পারলুম, সে কী ভাবছে। ছোটমামা আমাকে তো কোনওদিন বললেন না, আয় রানি, তোকে একটু শেখাই। ছলছলে দুটো চোখে ঘরের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে। রানিদিদিরও তো অনেক কিছু শেখার ইচ্ছে ছিল। কলেজে পড়বে, গান শিখবে। সে সব স্বপ্ন, স্বপ্নই রয়ে গেল। আমি যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে গেলুম। প্রশ্ন এল মনে, উত্তর দেবে কে?

আধ ঘণ্টার চেষ্টায় আরতি ব্যাপারটাকে বেশ রপ্ত করে ফেলল। তারের ঘর্ষণে তার ফরসা আঙুলের মাথাটা লাল হয়ে গিয়েছে। যেন একটা করমচা। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি ঘরের বাইরে দরজার পাশে রানিদিদি বসে আছে। মুখের চেহারাটা বেশ করুণ। সেই দিকে তাকিয়ে আমি তার মনের ভাবটা বুঝতে পারলুম, সে কী ভাবছে। ছোটমামা আমাকে তো কোনওদিন বললেন না, আয় রানি, তোকে একটু শেখাই। ছলছলে দুটো চোখে ঘরের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আরতি সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা বেশ অবলীলায় তুলে নিতে পারল। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, তিনি একটু অবাক হয়েছেন। দাদুও বসে আছেন। তিনি যখন বসেন, মনে হয় ধ্যানে বসেছেন। কোনও এক ঋষি। মাথায় বড় বড় চুল, চোখ দুটো সব সময় যেন ধক ধক করে। কোন জগতে থাকেন কে জানে! এমন সময় সিঁড়িতে বিকট কাশির শব্দ। বাবুয়া কাল রাত্তির থেকে তার দাদা রামুয়াদার কাছে আছে। রামুয়াদা চৌধুরী জমিদারদের গাড়ির ড্রাইভার। শান্তশিষ্ট সুন্দর এক মানুষ। বাবুয়ার সঙ্গে কাশতে কাশতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে বাবাকে নমস্কার করে বললেন, আমি আর পারছি না। একটু ওষুধ দেবেন। খুব জ্বরও এসেছে। বাবা আমাকে বললেন, আমার হোমিওপ্যাথি বাক্সটা আর স্টেথোস্কোপটা নিয়ে এসো। নিয়ে এলুম। রামুয়াদাকে পরীক্ষা করে বললেন, এ তো ব্রঙ্কাইটিস। কী করে বাধালে? দেখি কী করা যায়। তাঁর হোমিওপ্যাথির বাক্সটায় পর পর অনেক গোল গোল ফুটো। সেই ফুটোগুলোতে দাঁড় করানো আছে সরু সরু গোল গোল অনেকগুলো শিশি। তার পাশে আবার একটা ছোট্ট খালের মতো জায়গা। সেখানে পুরিয়া করার জন্য ছোট ছোট কাগজ কাটা রয়েছে। আর রয়েছে সুগার অব মিল্কের শিশি। বাবা সেই বাক্স থেকে একটা শিশি তুলে নিলেন। বাবা যখন চিকিৎসা করেন, তখন কম্পাউন্ডারের কাজটা আমাকেই করতে হয়। তিনি আমার হাতে সেই শিশিটা আর কতগুলো কাটা কাগজ দিয়ে বললেন, ওই টেবিলে চলে যাও, সাতটা পুরিয়া কর। আরতি এস্রাজটা নামিয়ে রেখে বললে, আমি যাই, একটু সাহায্য করি। বাবা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন আরতির দিকে। তাঁর মুখে এই প্রথম একটা অদ্ভুত সুন্দর স্নেহ মাখানো প্রসন্নতা দেখলুম। এস্রাজের ছড়িটা আরতির হাত থেকে নিয়ে, তার মাথায় আস্তে করে মেরে বললেন, যাও সাহায্য কর। তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আরতিটা এত পাজি আমার পাশে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে কুট করে আমার কানটা কামড়ে দিলে। লোকে যেভাবে ঢেকুর চাপে, আমি সেই ভাবে উহ্‌হ শব্দটা চেপে গেলুম। সাতটা পুরিয়া তৈরি হয়ে গেল। তাতে আবার এক, দুই, তিন করে নম্বর দেওয়া হল। বাবা আর একটা শিশি নিয়ে যেতে বললেন। সেটার একটা আলাদা পুরিয়া হল। এইবার বোঝাতে লাগলেন, প্রথম পুরিয়াটা খাওয়ার পর তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর বাকিগুলো খেতে হবে। দাদু একটু উসখুস করছিলেন। বললেন, যদি অনুমতি দাও তো তাহলে আমি একটা টোটকা বলতে পারি। বাবা বললেন, বাসক পাতা তো? বাসক পাতা আমাদের বাগানে আছে। হ্যাঁ, ওটাও চলবে, ওটাও চলবে। দাদু বললেন, অব্যর্থ। লবঙ্গ,

দারচিনি এইসব দিয়ে ফুটিয়ে বেশ করে এক কাপ যদি খায়, কাশিটা বন্ধ হয়ে যাবে।

কাশি পর্ব শেষ হল। ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছে। চায়ের ব্যাপারে বাবা খুবই খুঁতখুঁতে। নিজেই কিনে আনেন তাঁর বাঁধা দোকান থেকে। অসম আর দার্জিলিং ব্লেন্ড। বাবা ঘড়িটা দেখে মেসোমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার মেয়ে এখানেই থাক না। দুপুরবেলা আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে। তারপর আমি ওকে নিয়ে বসব। তারপরে বললেন, আর যদি আপত্তি না থাকে আজকের দুপুরের আহারটা আপনি এখানেই সারুন না। মেসোমশাই বললেন, আমার যে এখনও কয়েকটা কাজ বাকি আছে। যদি অনুমতি দেন, আমি সেগুলো সেরে আসি। ঠিক ক'টার সময় আপনারা বসবেন? বাবা বললেন, এই ধরুন না, তিনটে নাগাদ। মেসোমশাই একটু থমকে গেলেন। বললেন, এত দেরিতে খাওয়া-দাওয়া করেন! বাবা অমায়িক হেসে বললেন, মাঝে মাঝে চারটেও হয়ে যায়। মেসোমশাই বললেন, ঠিক আছে আমিও এসে যাচ্ছি। মেয়েটা এখানেই থাক। কিন্তু একটা কথা, এটাকে বেশি স্বাধীনতা দেবেন না। কী যে করে বসবে কেউ জানে না। বাবার মুখটা হাসিতে ভরে উঠল, তিনি বললেন, ঠিক বলেছেন, এ মেয়ে যে কী করে বসবে কেউ জানে না। দাদু বললেন, রবিবার সকালে আমি তো একটা দুটো গান গাই, আজ কি সেটা হবে না? বাবা বললেন, হবে হবে, সব হবে। সপ্তাহের ছ'টা দিন ঘড়ি আমাদের চালায়। এই একটা দিন আমরা ঘড়িকে চালাব। দাদুর একটা তানপুরা আছে। এখানেই থাকে সেটা। এই তানপুরারও একটা গল্প আছে।

দাদু একদিন সকালে খুব উত্তেজিত হয়ে এসে বাবাকে বললেন, বুঝলে চিৎপুরের একটা দোকানে আমি একটা পুরনো তানপুরা দেখে এসেছি। তুমি জানো দোকানের মালিক আমার খুবই পরিচিত। সে বললে এই যন্ত্রটার একটা ইতিহাস আছে। এটা শিমুলিয়ার দত্তবাড়ির তানপুরা। ওদের বংশধররা এটা এখানে বেচে দিয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয়, এই যন্ত্রটিতে স্বামী বিবেকানন্দের হাতের স্পর্শ আছে। একেবারে সেকালের গঠন, বুঝলেন। আপনি একজন ধ্রুপদীয়া। এটি আমি আপনাকে উপহার দিচ্ছি। আমি তাকে বললুম, বিনা পয়সায় আমি তো নেব না। সে বললে, আমি তো এটা আপনাকে উপহার দিতে চাইছি। উপহারের কি দাম নেওয়া যায়? আমি বললুম, না, দাম না নিলে আমি নিতে পারব না। তখন সে বললে, ঠিক আছে আপনি আমাকে দশটা টাকা দেবেন। দাদু বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী বল, তানপুরাটা নিয়ে আসব? বাবা বললেন, অবশ্যই আনবেন। বলে তিনি দাদুর হাতে দশটা টাকা দিয়ে দিলেন। আমার এখনও মনে আছে, সেদিন বেলা আড়াইটে-তিনটের সময় সেই তানপুরাটিকে কোলের ছেলের মতো করে নিয়ে দাদু সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, আর বলছেন, এসে গিয়েছে, এসে গিয়েছে। যেন বিদেশ থেকে ছেলে ফিরে এসেছে। দাদুর আর তর সইছিল না। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে তানপুরাটা সুরে বাঁধতে শুরু করলেন। তখন বেলা চারটে কী সাড়ে চারটে। তানপুরা বেঁধেই আলাপ শুরু করলেন দাদু। বাবাকে বললেন, তোমার এস্রাজটা একটু লাগাও না। বাবা এস্রাজ নিয়ে বসলেন। রাত দশটা পর্যন্ত গান চলল। দাদু পরের দিনই চলে গেলেন হরিদ্বার। হরিদ্বার দাদুর খুব প্রিয় জায়গা। রেলে চাকরি করতেন। আমাকে বলতেন, একটাই তো যাওয়ার জায়গা আছে, হরিদ্বার। হরিদ্বার স্টেশনের বাইরে রাস্তার চৌমাথায় একটা স্তম্ভের ওপরে মহাদেবের মূর্তি। সেই মহাদেব নিজের মাথায় একটা ঘটি থেকে জল ঢেলে চলেছেন। এই মূর্তিটি নাকি দাদুকে মুক্তির পথ দেখায়। গুনে গুনে চল্লিশ বার হরিদ্বার গিয়েছেন।

আমি সেই তানপুরাটি এনে দাদুকে দিলুম। ম্যাও ম্যাও করে সেটিকে বাঁধা হল। ওস্তাদের মতো হাঁটু মুড়ে বসেছেন। দাদু কপালে হাত ঠেকিয়ে শ্রোতাদের বলছেন, ভৈরবী। সদা সুহাগিন এক রাত। শুরু হল আলাপ। এইবারে বাবা ধরেছেন এস্রাজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই জগৎটা যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা শ্রোতারা সব পাখির মতো নীল আকাশে উড়ছি। আর দাদু গাইছেন— 'মা মা মনসুখে মন ত্রিতন্ত্রী একবার বাজাও রে।' বিরাট গলা। সেই সঙ্গে তাঁর ভক্তি। দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বলা নেই, কওয়া নেই, আরতি হঠাৎ মেঝেতে মাথা ঠুকে একটা প্রণাম জানাল। বাবার এস্রাজে সুরের চলনের ছোট ছোট কাজ। মেসোমশাইয়ের চোখে ছিল সোনার ফ্রেমের চশমা। তিনি চশমাটা খুলে বুক পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে চোখ দুটো মুছলেন। এরপর ঘড়ি কী বলছে, দুপুরের খাওয়া কখন কী হবে, এসব চিন্তা স্রোতের টানে খড়কুটোর মতো যেন ভেসে চলে গেল।

একসময় গান থামল। বাবা আরতিকে বললেন, যন্ত্র হল ঈশ্বর। সেই ভাবে তার সেবা করা উচিত। আরতি, ছড়ির টান আলগা করে যন্ত্রটাকে মুছে খোলে ঢোকাও। আমাকে বললেন, তানপুরার লাউটা দেওয়ালে, দরজায় না ঠুকে ঠিক জায়গায় রেখে এসো। বাবা আমাকে যখনই যা বলবেন, তার মধ্যে একটু আক্রমণ থাকবেই। মেসোমশাইকে বললেন, আপনি তাহলে রেডি হয়ে আসুন। দাদু উঠে দাঁড়ালেন। এইবার তিনি গঙ্গায় স্নান করতে যাবেন। এই বাড়িতেই আছে তাঁর স্নানের কাপড়। স্নানের আগে তিনি নাকে কানে নাভিতে সর্ষের তেল দেবেন। দু'আঙুলে সর্ষের তেল নিয়ে নাকে টানবেন। তারপর যাবেন স্নানে। ছ-সাতখানা বাড়ি পরেই তো গঙ্গা। সেখানে একটা ঘরে পরপর তিনটি শিবলিঙ্গ আছে। আধ ঘণ্টা, কখনও এক ঘণ্টা। স্নান করে দাদু কী কী করবেন সেসব গল্প তো কথায় কথায় আগেই বলেছি। বাবা

দাদু একদিন সকালে খুব উত্তেজিত হয়ে এসে বাবাকে বললেন, বুঝলে চিৎপুরের একটা দোকানে আমি একটা পুরনো তানপুরা দেখে এসেছি। তুমি জানো দোকানের মালিক আমার খুবই পরিচিত। সে বললে এই যন্ত্রটার একটা ইতিহাস আছে। এটা শিমুলিয়ার দত্তবাড়ির তানপুরা। ওদের বংশধররা এটা এখানে বেচে দিয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয় এই যন্ত্রটিতে স্বামী বিবেকানন্দের হাতের স্পর্শ আছে। একেবারে সেকালের গঠন, বুঝলেন।

মেসোমশাইকে বললেন, আর একটা কথা। আমি নিজে গিয়ে বলতে পারছি না। আপনার কাছে অনুরোধ করব, যদি আপনার সহধর্মিণীকে নিয়ে আসেন, তাহলে আপনার মেয়ের হাতেখড়ির অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। দাদু সমর্থন করলেন, ঠিক ঠিক। বাবাও তো যাবেন গঙ্গাস্নানে। তিনি কখনও বাড়িতে স্নান করেন না। গঙ্গায় স্নান করবেন, তর্পণ করবেন। প্রতিদিনই। তখন তাঁর অন্য চেহারা। ঠোঁট দু'টি বিড়বিড় করে নড়তে থাকে। অর্থাৎ মন্ত্র চলছে ভেতরে। আর আমাকেও তো ঝপাং করে লাফিয়ে ওই গঙ্গার জলে পড়তে হবে। মা গঙ্গা যে দু'হাত বাড়িয়ে ডাকেন আমাকে। স্রোতের শব্দে বলতে থাকেন, চলে আয়, চলে আয়। দাদু একদিন আমাকে বলেছিলেন, জীবনটা সলিড নয়, লিকুইড। আর এই দেহটা একটা মশক, অর্থাৎ ভিস্তি। তার মধ্যে এই তরল জীবনটা ভরা আছে। তোমাকে একদিন শিখিয়ে দেব, দেহের বাইরে কী করে বেরিয়ে যাওয়া যায়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, আমার মায়ের কাছে কি যাওয়া যায়? দাদু কোনও উত্তর দিলেন না। আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে অস্ফুটে বললেন— ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সঙ্গীত ভেসে আসে।

আমাদের থমকে থাকা জীবনে আজকের দিনটি যেন একটা মুক্তির দিন। অনেকদিন পরে একটা উৎসবের মেজাজ তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে বাবুয়া ফিরে এসেছে। বাবা যেন বেশ ভরসা পেলেন। তাকে ডেকে ফিসফিস করে বললেন, ব্যবস্থা করে ফেল। আজকে তিনজন অতিথি বাড়িতে। খবর নাও কী কী আনতে হবে। এইরকম কোনও কাজ পেলে বাবুয়া হনুমানের মতো লাফাতে থাকে। সে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেল। আরতি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তারপরে সে ফিরে বললে, কাকাবাবু আমিও তাহলে ভেতরে যাই। বাবা আমাকে বললেন, তোমার এখন কী কাজ। আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি। বাবা বললেন, এই ঘরটাকে নিট অ্যান্ড ক্লিন করে রাখ। খাবার আসনগুলো বের করে রাখ। আর গেট রেডি, আজ আমরা একটু তাড়াতাড়ি চান করব।

মেসোমশাই বললেন, আমি আমার স্ত্রীকে নিয়েই আসব। এমন একটা পরিবারের সঙ্গে প্রথম আলাপেই আমি বুঝতে পেরেছি যে, এটি একটি বিরাট বৃক্ষ। এর ছায়ায় যতক্ষণ থাকা যায়, ততক্ষণই শান্তি।

আরতি করুণ গলায় বললে, আমি কোথায় চান করব? আমিও গঙ্গায় যাব। বাবা একটু চুপ করে থেকে বললেন, না, তোমার গঙ্গায় যাওয়া চলবে না। তুমি বাবার সঙ্গে বরং বাড়িতেই যাও। চান করে একসঙ্গে তিনজনে এসো। আরতি মুখ ভার করে বললে, আমি আজ তাহলে চানই করব না। মেসোমশাই হাসতে হাসতে বললেন, কী, বলেছিলুম না! দেখলেন তো, একে সামলাতে পারবে একমাত্র এর মা, আমার ক্ষমতায় কুলোবে না।

মেয়েদের চান আর ছেলেদের চানে অনেক তফাত। আরতির সঙ্গে এক সেট জামাকাপড় থাকলেও না হয় হতো। বাবা সেই দিকেই গেলেন। বললেন আমাদের বাড়িতে সেরকম বাথরুম নেই। কুয়োতলায় চান করতে হবে। তোমার পক্ষে সেটা ঠিক হবে না। তুমি চান করে, সেজেগুজে এসো। আমরা ততক্ষণ কয়েকটা পরিশ্রমের কাজ করে ফেলি। আরতি মুখ ব্যাজার করে তার বাবার সঙ্গে চলে গেল। পিসিমা এসে বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী কী রান্না করব? বেশ বুঝতে পারলুম দাদু কিছু একটা বলতে চাইছেন, কিন্তু বাবার ভয়ে বলতে পারছেন না। শুধু বললেন, নীহার তোমার হাতের মুগের ডাল, আহা, সে তো অমৃত! আর সেই চাটনি, যা খেতে খেতে চোখ বুজে আসে। পিসিমা বললেন, রবিবার দিন তো মাংস হয়। আজকে তো সেরকম ব্যবস্থা কিছু করা হয়নি। বাবা বাবুয়াকে বললেন, তুই দু'রকম মাছ নিয়ে আয়, আর টমেটোর চাটনি হবে। তারপরে বাবা বাবুয়াকে বললেন, আমি আর কী বলব, তুই তো সব জানিস। দাদু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, পোস্ত পোস্ত। নীহারের রান্না পোস্ত খেলে মনে হয় যেন স্বর্গে আছি। বাবা তা শুনে বললেন, স্বর্গে তো বাতাস ছাড়া আর কিছু নেই। বরং নরকে অনেক রকম ব্যবস্থা আছে। বাবুয়া জিজ্ঞেস করল, কী মাছ আনব? বাবা দাদুর দিকে তাকিয়ে বললেন, চিংড়ি মাছ হলে কেমন হয়? দাদুর মুখে একটা স্বর্গীয় ভাব। বললেন, আহা, কতদিন খাইনি। বাবা বাবুয়াকে বললেন, তাহলে চিংড়ি আর রুই। বাবুয়া ইংরেজিতে বললে, ভেরি গুড। পিসিমা একটু যোগ করলেন। শেষ পাতে তাহলে আমাদের পরেশের দই। বাবা বললেন, রাইট। কিন্তু মনে থাকে যেন দুটোর মধ্যে সব শেষ করতে হবে। একটু ভেবে আবার বললেন, না, বাবুয়ার হাতে সবটা ছাড়া উচিত হবে না। আমিও যাই ওর সঙ্গে। ব্যস, দু'জনে বেরিয়ে গেলেন বাজারে। আমি আর দাদু কিছুক্ষণ বসে রইলুম। আমাদের চান তো গঙ্গায়। রবিবার যখন বাবার সঙ্গে গঙ্গায় চান করতে যাই, তখন অনেকেই রসিকতা করে প্রশ্ন করেন, কালকের চানটা কি আজকেই সেরে রাখছ? আমরা তো একটু পরে চা খাব। এমন প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের মাঝে মাঝেই পড়তে হতো। বাবা একটা গল্প বলতেন। ইংল্যান্ডে একজন ব্যারন ছিলেন। তিনি তাঁর নিজস্ব ঘড়িতে চলতেন। কখন ব্রেকফাস্ট, কখন ডিনার— তাঁর কিংডমে তাঁর নিজের ঘড়িই কাজ করত। সময়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এক একটি দেশের এককে রকম সময়। ব্যারনের প্যালেসেও তাঁর নিজের সময়! সে বেশ মজার! এসব ইতিহাস বাবার খুব জানা ছিল।

দুটোর সময় আরতিরা সব এসে গেলেন। আরতির মা একটা কিছু রেঁধেছিলেন, সেটা তিনি একটা পাত্রে ভরে নিয়ে এসেছেন। আর যা করেছেন, জানি না তা দেখলে বাবা কী করবেন। কিনেছেন নতুন একটা ধুতি, একটা পাঞ্জাবি। বাবাকে আমি কখনও পাঞ্জাবি পরতে দেখিনি। শুনেছি জীবনে তিনি একবারই পাঞ্জাবি পরেছিলেন, সেটা তাঁর বিবাহের রাতে। এনেছেন এক শিশি আতর। মিষ্টি আর ফলমূল তো আছেই। হাতেখড়ির গুরু প্রণামের জন্য। বাবা এসব একদম পছন্দ করেন না। কিন্তু খুব সংযতভাবেই কোনও প্রশ্ন না তুলে সেগুলো গ্রহণ করলেন। তারপরে সকলের অনুমতি নিয়ে চলে গেলেন তাঁর পূজার ঘরে।

আরতিদের পরিবারটি বেশ মিশুকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হল, আমরা সবাই যেন একই পরিবারের সদস্য। আনন্দের জোয়ার এল। তবে সে আর কতক্ষণের জন্য। বাবাকে মাঝে মাঝেই একটা গানের লাইন গাইতে শুনেছি।—

'শ্মশান ভালোবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবে সেথায় নিরবধি!'

(চলবে)

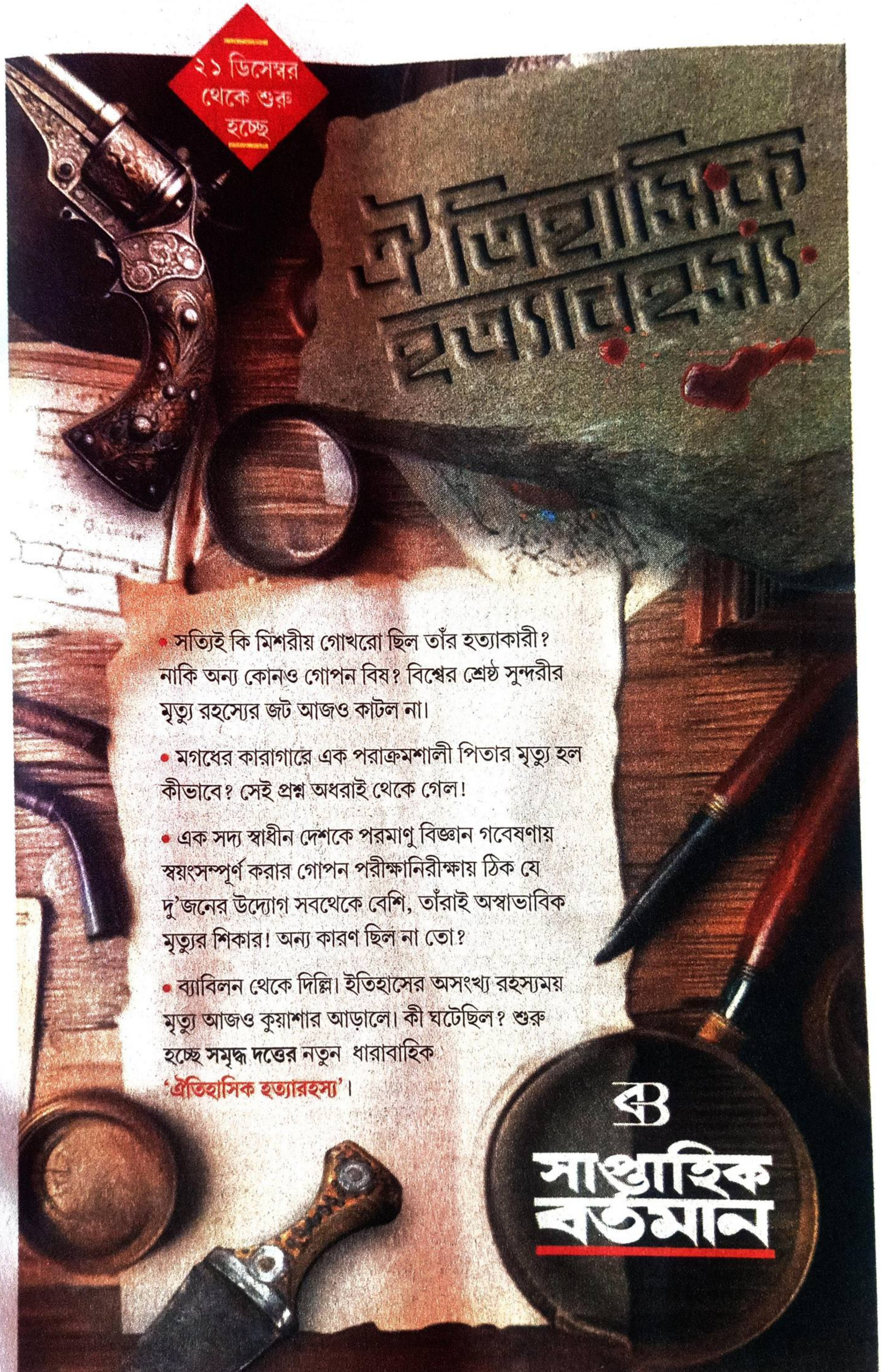
২১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে
ঐতিহাসিক হত্যারহস্য
• সত্যিই কি মিশরীয় গোখরো ছিল তাঁর হত্যাকারী? নাকি অন্য কোনও গোপন বিষ? বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর মৃত্যু রহস্যের জট আজও কাটল না।
• মগধের কারাগারে এক পরাক্রমশালী পিতার মৃত্যু হল কীভাবে? সেই প্রশ্ন অধরাই থেকে গেল!
• এক সদ্য স্বাধীন দেশকে পরমাণু বিজ্ঞান গবেষণায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করার গোপন পরীক্ষানিরীক্ষায় ঠিক যে দু'জনের উদ্যোগ সবথেকে বেশি, তাঁরাই অস্বাভাবিক মৃত্যুর শিকার! অন্য কারণ ছিল না তো?
• ব্যাবিলন থেকে দিল্লি। ইতিহাসের অসংখ্য রহস্যময় মৃত্যু আজও কুয়াশার আড়ালে। কী ঘটেছিল? শুরু হচ্ছে সমৃদ্ধ দত্তের নতুন ধারাবাহিক 'ঐতিহাসিক হত্যারহস্য'।
সাপ্তাহিক বর্তমান

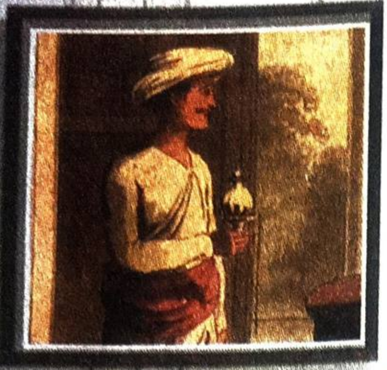

বাঙালির সেই গৃহ সহায়করা

সুরজিৎ ধর

সেকালের বনেদি পরিবার বা একান্নবর্তী সংসারে দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল একদল পরিচারকের। পাচক, মালি, খানসামা, বাজার সরকার, ঝি, চাকর ইত্যাদি কতই না বিভাগ ছিল। অনেকক্ষেত্রে এদের নিয়োগ করা হতো বংশ পরম্পরায়। আর তাদের বংশলতিকা ছিল মনিব বাড়ির মুখস্থ। সাধারণত মেদিনীপুর আর বর্ধমানের লোকেরাই এই কাজ করে আসত। তবে দারোয়ানের কাজটা ছিল পশ্চিমিদের একচেটিয়া। রোজ গাদাখানেক ছোলা-ঘি আর চিনি সাবড়ে, ডন বৈঠক-কুস্তি করে, বিশাল বপু বানালেও কোনও হাঙ্গামা ঠেকাতে ছিল অষ্টরম্ভা। এসব কাজে বরং দেশীয় কৈবর্তরাই ছিল বেশি নির্ভরযোগ্য। দারোয়ানরা থুতনির মাঝে দাড়ি কামিয়ে, দু'পাশে শ্মশ্রুরাশি কাপড় দিয়ে বেঁধে উঁচু করে রাখত। ঘরের কাজের লোকদের এই বাহারি গোঁফ রাখার অধিকার ছিল না। মনিবের সামনে তারা গোঁফ নেড়ে কথা বলবে, এটা ছিল সকলের অসহ্য। তবে গলায় দু'গাছি কণ্ঠী অবশ্যই ধারণ করতে হতো। ইংল্যান্ডের প্রথা অনুসরণ করে পরাধীন ভারতেও এই আজব প্রথা চালু হয়েছিল। শোনা যায়, ১৮৯৭ সাল নাগাদ একদল গোঁফহারা নফর সভা করে, তাদের গোঁফ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, এক দরখাস্ত করলেও শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল তা আর জানা যায়নি।

বাপ-ঠাকুরদার আমলের এইসব 'পুরাতন ভৃত্যের' সম্মান পরিবারে বিন্দুমাত্র কম ছিল না। ছেলে বা নাতির বয়সি উত্তরসূরিরা তাদের সামনে ধূমপান করত না। সর্বদা আপনি আজ্ঞে বলে কথা বলত। তাদের পুজো বা ব্রতপালন, তীর্থভ্রমণ, দান-ধ্যানের খরচটা সংসার থেকে পেত। মাস মাইনের টাকাটা তাদের ধরাই থাকত। দেশের বাড়িতে আপন ছেলেমেয়ে বা আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে দীর্ঘ অদর্শনে, সম্পর্কের সুতোটা আলগা হয়ে যেত। তবে মৃত্যুকালে তার জমানো টাকাটা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিত। বাংলা সাহিত্যে এই কেষ্টা, রাইচরণদের সঙ্গে ব্যোমকেশ বক্সীর পুঁটিরাম, কিরীটী রায়ের জংলি, আর প্রফেসর শঙ্কুর প্রহ্লাদের কথা কেউ কি ভুলতে পারবে? এখানকার কিছু খ্যাতিমান মনিবের সঙ্গে কয়েকজন 'কেষ্টা' ও ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। তাদের কর্মকাণ্ডের কথা আজও খুঁজলে পাওয়া যাবে।

রামমোহন রায়ের কাছে কাজ চাইতে এসে শম্ভুচন্দ্রের প্রথমেই কোপ পড়ল তাঁর পিতৃদত্ত নামের উপর। দেওয়ান সাহেব তাঁর নাম দিলেন 'রামরত্ন'। সেদিন বলে দিলেন, কাগজে কলমে সেরেস্তা দপ্তরে এখন এই নামই চলবে। জোড়হাত করে শম্ভুচন্দ্র তাই মেনে নিল। পুরনো নামটির প্রতি একটা টান বোধহয় তখনও রয়ে গিয়েছিল। ব্যাজার মুখে বাগানের মালির কাছে ব্যাপারটা বলেই ফেলেছিল। তা শুনে মালি একগাল হেসে বলে, 'আরে এতে দুঃখ পাওয়ার কী আছে। আমিও তো ছিলাম হরিচরণ দাস। দেওয়ানজির পাল্লায় পড়ে হয়ে গেলাম 'রামহরি'। বাবুর নামের একটু ছিটে তবু তো আমাদের নামেও রয়ে গেল।'

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতের নিষ্কর ভূমির মালিকদের অঙ্গীকার করেছিলেন যে, আদালতে তাদের জমির সনদ অসিদ্ধ প্রমাণ না হলে তা দখল করা হবে না। কিন্তু ১৮২৮ সালে তৃতীয় রেগুলেশনে লাটসাহেবের প্রতিশ্রুতি রক্ষিত না হলে, রামমোহন

সরকারের কাছে এক প্রতিবাদলিপি পাঠালেন। ইতোমধ্যে দিল্লির বাদশাহ তাঁকে দিলেন 'রাজা' উপাধি। রাজা দিনে প্রচুর দুধ খেতেন। সেজন্য বিলেত যাত্রাকালে দু'টি গাই আর ভৃত্য হিসেবে রামরত্ন আর রামহরিকে সঙ্গে নিয়ে যান।

বিলেত এসে রামমোহন কোর্ট অব ডিরেক্টর্সে নিষ্কর জমির মালিকদের পক্ষ নিয়ে রামরত্নের নামে একটি আর্জি পেশ করেন। বোর্ডে তা খারিজ হয়ে গেলে তিনি তা পুস্তিকাকারে বাজারে ছাড়েন। টাইমস পত্রিকা তা দেখে সরকারের কড়া সমালোচনা করলে, তার ঢেউ কলকাতায় আছড়ে পড়ে। ১৮৩৩ সালের এপ্রিল মাস জুড়ে রামরত্নকে নিয়ে চলল এক রুদ্ধশ্বাস কাহিনি। সকলের মনে প্রশ্ন জাগল, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় বাবুটি কে? এ নামে তো কাউকে বিলেতে যেতে শুনিনি। শেষ পর্যন্ত বিস্তর গবেষণা ও তদন্ত চালিয়ে তারা জানাল—'রামমোহন রায়ের সমভিব্যাহারে এতদ্দেশীয় একজন দীন ব্রাহ্মণের সন্তান। এখানে তাঁহার পাচক ছিল সেই গিয়াছে। তাঁহার পরিচর্যা করিবেক, কিঞ্চিৎ বেতন পাইবেক। সেই ব্যক্তির নাম রামরত্ন মুখোপাধ্যায় হইবেক। রাজাজী চতুরতা করিয়া ঐ আরজিতে তাহার নাম দিয়া তথায় দরপেশ করিয়াছেন।'

রামমোহন স্টেপলগ্রোভে এলে অতিথি অভ্যাগতরা আসতে থাকে। এখানেই মেনিনজাইটিসে ভুগে ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। সেই সময় রামরত্ন রাজাজির কানের কাছে মন্ত্রপাঠ করতে থাকে। উপস্থিত সাহেবদের কাছে তা হিন্দির মতো শুনতে লাগলেও তারা সাক্ষ্য দেয় ''দ্য ফ্রিকোয়েন্ট রিপেটেশন অব দ্য ওয়ার্ড 'ওম'।'' বিষণ্ণ রামহরি আর রামরত্ন দেশে ফেরে। জাহাজঘাটায় অবাক হয়ে দেখে, বিখ্যাত লোকেরা তাদের কাছে এসে রাজাজির কথা জানতে চায়। এরমধ্যে লাটভবন থেকে এক উর্দিপরা আর্দালি কুর্নিশ করে একটি চিঠি ধরিয়ে বলে, 'লাটসাহেব আর মেমসাহেব দু'জনেই তাকে ডেকেছেন।' ধোপদুরস্ত হয়ে রামরত্ন লাটের কাছে এলে, তাঁরা দু'জনেই রাজার কথা শোনেন। শেষে বলেন, 'তুমিই তো রাজার ইন্ডিয়ান প্রাইভেট সেক্রেটারি।' এতদিন রামরত্ন সাহেবদের দেশে 'সারভেন্ট' কথাটিই শুনে আসছিল। সেক্রেটারি কথাটি তাঁর খারাপ লাগল না। শেষকালে লাটের বদান্যতায় রামরত্নকে মুর্শিদাবাদে ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত করা হয়। কাগজগুলোতে ফলাও করে তা ছাপা হয়। রায়বাহাদুর খেতাবটিও জুটে গেল অচিরে। এদিকে রামহরিও একদিন এসে, তাকে অভিবাদন জানিয়ে বলে গেল, 'রাজার দেওয়া নামের জাদু এখন বুঝতে পারছ তো? শম্ভুচন্দ্র নামটি থাকলে সারাজীবন খুন্তি নেড়েই যেতে হত।'

'হুদা ঈশানপুর খাসমহল' দেখাশোনার কাজ ছিল রামরত্নের। কিন্তু পেটে সেরকম বিদ্যে না থাকায় আর একটু ঢিলেঢালা স্বভাবের জন্য শেষ পর্যন্ত চাকরিটা টিকল না। তবে ততদিনে যা গুছিয়ে নেওয়ার তা করে নিয়েছিল। ওদিকে রামহরিরও কপাল খুলে গেল। তারও জুটে গেল রাজার চাকরি। বর্ধমানের মহারাজা তাঁর গোলাপবাগে হেডমালির পদে বহাল করলেন বিলেত ফেরত রামহরিকে। এখান থেকেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে বোলপুরে চাকরি নিল রামহরি। শান্তিনিকেতনের অনেক পুরনো গাছপালাই রামহরির হাতের তৈরি।

সারাজীবন বিদ্যাসাগর কুলিগিরি, পাচক, রোগীর সেবার্থে মল-মূত্র পরিষ্কারের নজির দেখিয়ে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। ফোর্ট উইলিয়ামের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হয়ে কলকাতার বাসায় থাকতেন। তখন শিক্ষার জন্য নিজের আর খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে প্রধান ভৃত্য ছিল শ্রীরাম নাপিত। সব নিয়ে ন'জন। পালা করে তখন রান্নার কাজ চলত। বউবাজারের তাঁর বাসার পাশে মোক্তার বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভৃত্যর ওলাউঠা হলে মোক্তারবাবু তাকে রাস্তার ধারে ফেলে আসে। এই অমানবিক দৃশ্য দেখে বিদ্যাসাগর আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাকে সেখান থেকে তুলে এনে নিজের বিছানায় রেখে ডাক্তার ডেকে কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ করে তোলেন। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে তিনি বিদ্যাসাগর হতে পেরেছিলেন বলেই নিঃস্বদের প্রতি তাঁর এত টান। অধ্যাপনা সহ দিনে দিনে নানা কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে, আর নিজের হাতে রান্না করার কাজটা করার দরকার হয়নি। কলকাতায় তাঁর বাড়িতে পঁচিশ বছর ধরে রান্নার কাজটি করে আসছিল পোলপাতুলের হরকালী চৌধুরী। বর্ধমানের বাড়িতে গেলে হরকালীও সঙ্গে যেত। সেখানে গেলে গরিব স্ত্রীলোকেরা কাপড় আর টাকার আশায় বিদ্যাসাগরের কাছে ভিড় করত। একবার একজন মহিলা পুনর্বার ভিক্ষা চাইতে এলে হরকালী রেগে গিয়ে বলে ওঠে, '..., বিদ্যাসাগরকে কি তোরা লেদা আমগাছ পেয়েছিস?' তার কথা শুনেই বিদ্যাসাগর রেগে গিয়ে হরকালীকে বলেন, 'তোমার কত পাওনা আছে বুঝে নিয়ে এখুনি বিদেয় হও। গরীবদের আমি দান করব, তাতে তোমার বাবার কী?' ভুল বুঝে হরকালী মাফ চেয়ে ঘটনাটা বলতে বিদ্যাসাগর তাকে দু'টাকা মাসোয়ারার ব্যবস্থা করে বিদেয় দেন।

বীরসিংহ গ্রামের বাড়িতে বিদ্যাসাগর এলেই তাঁকে দু'হাতে টাকা বিলোতে দেখে তাঁর নিজের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা তাদের ধনী ভাবতে শুরু করে। সেজন্য ১১৫৯ সনে ৩০ বৈশাখের রাতে বাড়িতে ডাকাত পড়লে, খিড়কির দরজা দিয়ে সকলে পালায়। এই ঘটনার পর পাহারা দেওয়ার জন্য গোঁসাই ও ফকির দাসকে নিয়োগ করা হয়। এক বছর পরে সেইস্থানে আসে চিন্তামণি ও পরাণ নামে দুই সর্দার। এরপরে শ্রীমন্ত সর্দার বিধবা বিবাহের সময় বিদ্যাসাগরের রক্ষী হিসেবে কাজ করেছে। মায়ের আজ্ঞায় বাড়িতে এক বিয়েতে উপস্থিত হওয়ার জন্য, ভরা বর্ষায় দামোদর অতিক্রম করার কাহিনি আমরা শুনে আসছি। সে সময় অতি পুরাতন ভৃত্য শ্রীরামও তাঁর সঙ্গে ছিল। কলকাতা থেকে হেঁটে দামোদরের পাড় ধরে পাঁচ ক্রোশ দূরে পাতুল গ্রামে তাঁর বাড়ি। বিদ্যাসাগর তাকে বাড়ি যেতে দিয়ে, সে রাতেই দামোদর পার হন।

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা পুরোটা কেটেছিল ভৃত্যদের সান্নিধ্যে। সেখানে তাদের কঠোর অনুশাসনের কথা জীবনস্মৃতির 'ভৃত্যরাজক তন্ত্র'-তে দেখতে পাই। পরিণত বয়সে কবির নিজস্ব ভৃত্য ছিল বনমালী। যাকে তিনি মজা করে বলতেন লীলমণি বা নীলমণি। ১৯৪১ সালে কবির শরীর খুব খারাপ। এমন সময় জমিদারির খাজনা ত্রিশ টাকা বউকে পাঠালেও কেন তা জমা পড়ল না, তা জানতে বনমালী উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ঠিকমতো খাজনা জমা না পড়লে জমি নিলামে উঠবে। তাই সে দেশে গিয়েছিল কয়েকদিন জন্য। দেশ থেকে ফিরে এসে স্নান সেরে কবির কাছে যাবে বলে ঠিক করে। বনমালীর জন্য কবিরও উৎকণ্ঠার শেষ নেই। উপস্থিত রানি মহলানবিশকে বলেন, 'ওর কথা প্রায়ই ভাবছি। বাঁদরটা কাছে আসছে না কেন?' শেষে রানির ডাকে সেই অবস্থায় এসে বনমালী জানায়, 'স্ত্রীর হাতে অত টাকা দেখে, তাঁর ভাই তাকে ফুঁসলে বাড়িতে নিয়ে যায়। তবে দু'টাকার বেশি খরচ করেনি। বাকি টাকায় খাজনা ঠিক সময়ে দেওয়াতে, জমিও নিলাম হয়নি।' সব শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে

কবি বলেন— 'যা এবারে স্নানটান কর গিয়ে।'

১৩৪৮ সনে ২৫ বৈশাখে শান্তিনিকেতনে কবির জন্মদিনে এই বনমালী তো 'বশীকরণ' নাটকটিতে অভিনয় করে রীতিমতো হিরো বনে গেল। সন্ধেবেলায় উদয়নের পুবদিকের আঙিনায়, শামিয়ানার নীচে দর্শকদের বসার জায়গা হয়। সেদিনের বিশেষ অতিথি সত্যেন্দ্রনাথ বসু বসেন 'উদীচী'র নীচের তলায়। কবি চাতালের একধারে আরাম কেদারায় বসলেন। নাটকে চাকরের ভূমিকায় বনমালীকে দেখে সকলে তো হেসেই খুন। সে কিন্তু তা পরোয়া না করে, একেবারে স্বাভাবিকভাবে— 'আজ্ঞে হ্যাঁ মা ঠাকুরুন' বলে হুকুম তামিল করতে থাকে। অতিথিদের খাবার পরিবেশন, হাত ধোয়ানো ইত্যাদি চেনা বৃত্তের কাজগুলি নিপুণভাবে করে সকলকে অবাক করে দেয়। তার প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ হলে একগাল হেসে বনমালী বলে, 'বাবা! আমি কখনও কিছু করি নাই। তার উপরে বাবামশাই সামনে বসা। কথা বলার সময় তো গলা বুজে আসছিল। গৌরীদিদি (নন্দলাল বসুর বড় মেয়ে) জোর করে নাটকে ভরে দিলেন, আমি কী করব?'

কবি তখন প্রসংশা করে বলেন, 'কেন তোর তো বেশ ভালোই হয়েছে।' আড়ালে রানিকে বলেন, 'আমার লীলমণির কত গুণ দেখ। বাঁদরটা আমার কাছে থেকে নাটক করতে শিখে গেল।' কবির শেষ জীবনে তাঁর পুরনো সঙ্গী বনমালীও বেশ অথর্ব হয়ে পড়েছিল। রানি তাই তাদের পুরনো লোক রামচরিতকে তাঁর কাছে পাঠান। সে বিহারের লোক হলেও দিব্যি বাংলা বলতে পারে। তবে দোষের মধ্যে একটু গম্ভীর। একজোড়া প্রকাণ্ড গোঁফে মুখটা সর্বদা অন্ধকার থাকত। চটপট কাজে দক্ষ রামচরিতকে পেয়ে প্রতিমা দেবী খুশি হলেও, কবি রানিকে বলেন, 'দোহাই রাণী, ঐ গুণের চাকরকে তুমি ফিরিয়ে নাও। আমি মানছি ও খুব কাজের লোক, বৌমাও চান আমার কাছে থাকুক। কিন্তু কি করে ওকে রাখি বল? ওর মুখ দেখলে আমারও মন খারাপ হয়ে যায়। কোনরকম ঠাট্টা তামাশা কোরতে পারিনে। ঠাট্টা করলেও ও হাসতে জানে না। শুধু কাজ দিয়ে আমি কি করবো? আমার নীলমণি আর কিছু না পারুক, পেট ভরে হাসতে জানে। ঠাট্টাতেও যোগ দেয় বলে ওর কাছে আনন্দ পাই। ওর হাত-টাতগুলো একটু কাঁপে বটে, তবু ওকে নিয়ে চালিয়ে নেব। ঐ গম্ভীর মুখের একজোড়া গোঁফ আর দেখতে পারছিনে।' কিছুদিন পরেই কবির মৃত্যুর পর শেষ দেখার সময় সকলেই ভিড় সরিয়ে বনমালীকে দেখার সুযোগ করে দেয়। তাদের সম্পর্কটা শুধু প্রভু-ভৃত্যের ছিল না। স্নেহ ভক্তির গভীর বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল। সেখান থেকে বিদায় নেওয়ার সময় বনমালী রথীন্দ্রনাথ এবং আরও কয়েকজনের কাছে কবির কিছু পুরনো বই সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরে। সে সময় তাঁর পেনশনের ব্যবস্থা হয়। নিজে লেখাপড়া না জানলেও, বাড়ির কাছে একটা চালা বেঁধে কবির একটি ছবি টাঙিয়ে, বইগুলি পাশে রেখে দেয়। প্রতিদিন সেখানে কয়েকজন জমায়েত হয়ে কবিকে স্মরণ করত। এটাই বুঝি কবির প্রতি সেরা শ্রদ্ধাঞ্জলি।

স্বামী বিবেকানন্দের সহোদর মহেন্দ্রনাথ দত্তের একটি লেখা থেকে জানা যায়, ১৯২০-'২১ সাল নাগাদ ঠাকুরদার আমলের তাঁদের অতি পুরাতন কাজের মহিলা মৃত্যুর দিন চারেক আগে তাঁকে বলে, 'দেখ, তোর পিতামহের সময় এ বাড়ীতে এসে, সারা জীবন কাটালাম। তোর বাপ খুড়োরাও সংসারে অপর রাঁধুনি চাকরানিকে নিজেরা কাঁধে করে সৎকার করেছে। আমার সময়ে অন্য কেউ যেন দেহ না ধরে। নিজেরা নিয়ে সৎকার করে, শ্রাদ্ধে কাঙালি ভোজন করিও।' তার মৃত্যুর পর বাড়ির অপর ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে নিমতলা ঘাটে দাহ হয়।

কুশা সাউকে কাজী সাহেব পেয়েছিলেন, তাঁর পরিচিত শ্যামবাজারের এক পানের দোকান থেকে। আদ্যান্ত ধোপদুরস্ত পারফিউমের সুবাস ছড়ানো রূপবান এই কবির দিকে অবাক হয়ে দেখছিল অনাথ কিশোরটি। তাকে দেখেই তিনি বললেন, 'আমার বাড়িতে যাবি?' এক কথাতেই কুশা রাজি। ব্যস, সেই থেকে কুশা নজরুলের আমৃত্যু বিশ্বস্ত সহচর। তাঁর প্রাতঃকৃত্যের আগেই জল আর খবরের কাগজটি বাথরুমে রেখে আসত। তাঁর সুগন্ধি তেল, স্নো-পাউডার, ইস্ত্রিকরা ধুতি-পাঞ্জাবি, এমনকী সুগন্ধি মাখানো রুমালটি এগিয়ে দিয়ে বাদশাহি খাবার পরিবেশন করত কুশা। কাজী সাহেবের মানসিক বিপর্যয়ের সময় তাঁকে ঘিরে থাকা সর্বক্ষণের ভিড় কমতে থাকে। বাবুর সঙ্গে থেকে কুশাও কেমন খ্যাপাটে হয়ে যায়। নজরুল মাঝেমধ্যে মারমুখী হয়ে উঠলে তখন সে কবির কানে কানে কী যে বলত, তাতেই তিনি ক্রমে শান্ত হয়ে যেতেন। দু'জন যেন দু'জনের ভাষা বুঝতে পারত। রাঁচির মেন্টাল হাসপাতালে নজরুল ভর্তি হলে কবিপত্নী, আত্মীয়স্বজন আর কুশার থাকার ব্যবস্থা হল দু'মাইল দূর এক ডাকবাংলোয়। এক রাতে কুশার হঠাৎ মনে হল, বাবু তাকে ডাকছে। সেই অন্ধকারে হাসপাতালে এসে কাঁটাতার লাগানো পাঁচিল দেখে থমকে যায়। পাশেই একটা পেয়ারা গাছে উঠে যখন সে পাঁচিল টপকাল, তখন তার গা আর জামাকাপড় ছিঁড়ে একাকার! দারোয়ানের কথায় সাড়া না দিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে কীসব বলতে থাকে। ঘণ্টির আওয়াজে পুলিস এসে তাকে হাজতে রেখে দেয়।

পরের দিন ডিউটি অফিসার তাকে দেখে বলে, 'আরে এ তো কবির সেই খ্যাপাটে চাকরটা। ছেড়ে দাও ওকে।' ব্যস, পুলিসের হাতছাড়া হয়ে, কুশাও ছুটল বাবুকে দেখতে।

শেষ জীবনে নজরুল ঢাকাতে ধানমণ্ডির কবি ভবনে কিছুকাল থেকে বার কয়েক ঘর বদল করেন। শেষে আশ্রয় নেন ঢাকার পিজি হাসপাতালের ১১৭ নম্বর বেডে। একে একে সবাই বিদায় নিলেও একমাত্র কুশাই রয়ে গেল কবির বেডের বাইরের দোরগোড়ায়। বাবুর ডাকের অপেক্ষায়। সে বুঝতে পারেনি, বাবুও তাঁর অজান্তে চিরকালের মতো বিদায় নিয়েছে। কর্তৃপক্ষের দয়ায় দু'বেলা দু'মুঠো খাবার খেয়ে, সেই কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে একদিন সেও পাড়ি দেয় বাবুর কাছে।

মথুরের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের পরিচয় হয়েছিল জেলখানায়। সেখানে দেশবন্ধুর শরীর খুব অসুস্থ হলে তাঁর দেখাশোনার জন্য জেলকর্তারা মথুরকে কাছে রাখেন। সে ছিল ডাকাতির আসামি; কিন্তু দেখলে মোটেই তা মনে হতো না। ক'দিনের মধ্যেই চিত্তরঞ্জনের প্রতি তাঁর এত ভালোবাসা জন্মে যায়, যে ধমকের সুরে সময় মতো স্নান করাত। একটু বেলা হলে বিশ্রাম নিতে বলত। তার শাসন সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্করবাবুও নতমস্তকে মেনে নিয়েছে। দেশবন্ধু মুক্তি পেলে, ক'মাস পরেই মথুরও ছাড়া পেল। কথামতো মথুর চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে কাজে নিযুক্ত হয়। তার দরদভরা শ্রদ্ধা ও সেবাতে সকলেই মুগ্ধ। ঘর ভর্তি লোকের আলোচনার মধ্যে এসে মথুর শাসনের সুরে বলত, 'বাবা আর গল্প করতে হবে না, অনেক বেলা হয়েছে এবারে উঠুন। স্নানের জল তৈরি।' অভ্যাগতদের দিব্যি বলতে পারত, 'আপনারা কি বাবাকে নাওয়া খাওয়া করতে দেবেন না?'

এই ধরনের ভালোবাসার শাসন এখন বুঝি হারিয়েই গিয়েছে।

ব্যুমেরাং

সিদ্ধার্থ নাহা

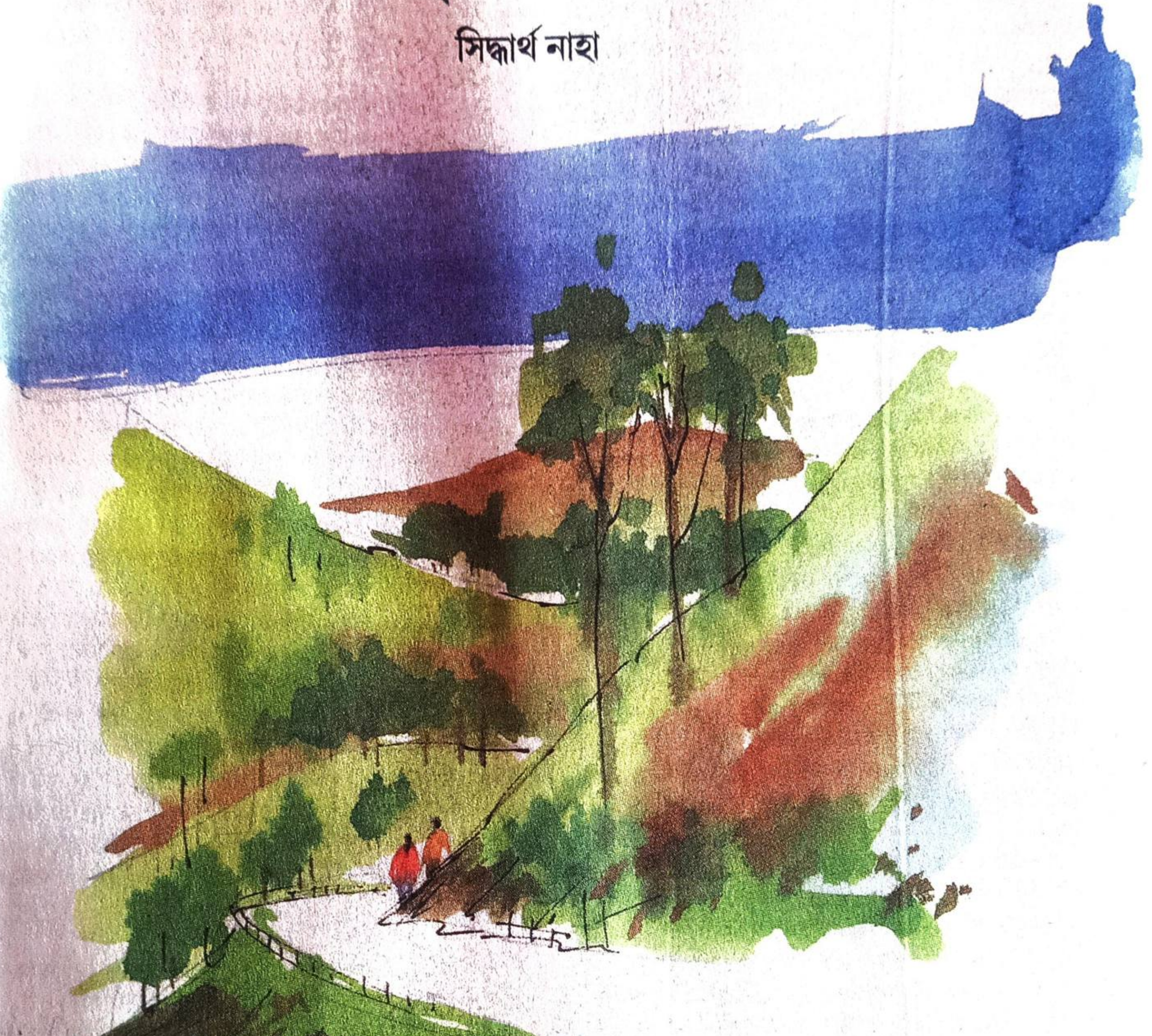

অসাধারণ রূপ লাবণ্য ঢালা প্রাকৃতিক দৃশ্য। খাড়া পাহাড়ে চলার উপযোগী গাড়ি পিচ ঢালা মসৃণ রাস্তা বেয়ে ওপরের দিকে উঠছে। রাস্তা বেশি চওড়া নয়। দুটো গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে না। এ জন্যে জায়গায় জায়গায় কিছুটা করে অংশে দুটো গাড়ি পাশাপাশি চলার মতো রাস্তা কিছুটা চওড়া। এমনিতে এ রাস্তায় গাড়ি চলাচল খুব কম। তার মধ্যেও হঠাৎ হঠাৎ উল্টোমুখী কোনও গাড়ি দেখা গেলে রাস্তার চওড়া অংশে একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। যে গাড়িটি পাহাড়ের ওপরে উঠছে তাকে আগে যেতে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে দুর্গম এ রাস্তায় গাড়ির চালকদের মধ্যে রয়েছে অত্যন্ত ভালো সমঝোতা। রাস্তা কখনওই সোজা নয়। পাহাড়ের গা বেয়ে একের পর এক খাঁজ এবং ইংরেজি ইউ অক্ষরের মতো বাঁক পেরিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা। একটা বাঁক নিতে গেলেই মনে হয় এই বুঝি গাড়ি সোজা এগতে গিয়ে রাস্তা না পেয়ে সাঁ করে তলিয়ে গেল পাহাড়ের একপাশে গভীর খাদে তিস্তায়। গাড়ির কেউ কেউ তখন ভয়ার্ত মুখে চোখ বুজে

ফেলে।

গাড়িতে ওরা মাত্র দু'জন। চিরন্তন ও তৃষা। চালকের পেছনের সিটে বসে। ওদের গন্তব্য ভার্সে। উত্তর সিকিমের প্রায় শেষ প্রান্তের খুব ছোট জনপদ। সামান্য সংখ্যক লোকজনের বাস। তাদের দেখা মেলে হঠাৎ হঠাৎ। এলাকাটি যেন দৃষ্টিনন্দন প্রাকৃতিক রূপের মলাটে জড়ানো। একদিকে সুউচ্চ খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের গা যেন শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে পিচ রাস্তা। সংকীর্ণ রাস্তার পাশেই গভীর খাদ। খাদ এতটাই গভীর যে তাকাতে ভয় করে। খাদের নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া তিস্তাকে দেখলে মনে হয় যেন মেয়েদের চুল বাঁধার সরু ফিতে। বড় বড় বোল্ডার পাথরের ওপর দিয়ে চঞ্চলা কিশোরীর মতো নাচতে নাচতে চলেছে তিস্তা। পাহাড় গায়ে যতদূরেই দৃষ্টি যাক রংবেরঙের ফুলের বাহার। যেন গোটা পাহাড় গা জুড়ে চলেছে পাঁচমেশালি রঙিন ফুলেদের জলসা। জায়গায় জায়গায় পাহাড়ের গায়ে আকাশ পানে চেয়ে থাকা লম্বা লম্বা গাছ। গাছেদের গায়ে যেন ঝুলছে বর্ণময় ফুলের ঝালর। রকমারি অর্কিডগুচ্ছ। চিরন্তন আর তৃষা গিলে খাওয়ার দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে যাচ্ছে। ভাবখানা এমন যে, কথা বলতে গেলে ক্ষণিকের অন্যমনস্কতায় একটা রূপ যেন আর দেখা হবে না। তবুও ছন্দপতনের মতো একসময় তৃষা, 'এই? সব ঠিকঠাক ম্যানেজ করে এসেছে তো?'

—হ্যাঁ হ্যাঁ। একদম পারফেক্ট।

এমনটা শুনে তৃষা, 'দেশের বাড়ি থেকে তোমার মা-বাবা হঠাৎ আসবে না তো?'

—না না। মা-বাবা তো দেশ থেকে আসেই না। যদিও দূরত্ব বেশি নয়। কিন্তু গঙ্গাজোয়ার গ্রাম থেকে ৮০ কিমি পথ পেরিয়ে কলকাতা আসতে দু'বার বাস এবং দু'বার অটো পাল্টাতে হয়। বাবার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, আমি তো মা-বাবার সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ রেখেই চলি। অত টেনশন নিচ্ছ কেন? এতে বেড়ানোর স্বাদটাই নষ্ট হয়ে যায়। তোমার বাড়িতে সব ঠিক তো?

— হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাদের বাড়ি নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। তোমার বউ কিছু সন্দেহ করবে না তো?

—দূর! জয়িতার মাথায় এসব আসেই না। ও সারাদিন বাপের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলতে পারলেই সন্তুষ্ট। ওর মধ্যে অত ঘোরপ্যাঁচ নেই। নিপাট ভালো মেয়ে। আমি যে বিষয়ে যা বলি সবটাই বিশ্বাস করে চলে। বলতে পার, বুদ্ধিসদ্ধিতে একেবারে ঘট। কিংবা মাটিতে ফেলে রাখা মিষ্টিকুমড়ো। যেখানে যেমন রাখবে সেখানে তেমনটাই থাকবে। ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এর আগেও তো আমরা দু'বার ট্রিপ করে এসেছি। কোনও অসুবিধে তো হয়নি!

চিরন্তনের দিকে চটুল চাউনি রেখে তৃষা বলল, 'ট্রিপ বলছ কেন? বল অভিসার করে এসেছি।' প্রসঙ্গ পাল্টাতে চিরন্তন, 'এই এসব কথা বাদ দিয়ে বেড়ানোটা এনজয় কর তো।'

দুই

চিরন্তন একটি নামী বহুজাতিক সংস্থার চিফ মার্কেটিং ম্যানেজার। পার্ক স্ট্রিটে একটা নামজাদা কমার্শিয়াল কমপ্লেক্সে ওদের অফিস।

চিরন্তনের চেহারা অত্যন্ত হ্যান্ডসাম। স্লিম। পাঁচ এগারো। বয়স যে পঞ্চাশের কোঠায় দেখলে বোঝা যায় না। চোখে থ্রি পিস গোল্ডেন কালারের রিমলেস নীলাভ লেন্সের চশমা। কথাবার্তায় ও কাজেকর্মে অত্যন্ত চৌকস। কোম্পানির ক্লায়েন্টদের সহজেই অ্যাট্রাক্ট করে নিতে পারে। কোম্পানির চেয়ারম্যান, এমডি থেকে ডিরেক্টরস বোর্ডের সবাই ওর ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং আস্থাবান। যার জেরে ধাক ধাক করে ওপরের তিন-চারজনকে টপকে এখন কোম্পানির চিফ মার্কেটিং ম্যানেজার। অফিস দশটায়। কিন্তু চিরন্তন অফিসে চলে আসে সাড়ে ন'টার মধ্যে। রাত আটটার আগে অফিস থেকে বেরয় না।

চিরন্তন থাকে আমির আলি অ্যাভিনিউতে একটা অভিজাত ফ্ল্যাটে। স্ত্রী এবং একমাত্র সন্তান সঞ্চয়নকে নিয়ে ছোট সংসার। ছেলে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পড়ে। অফিসের কাজে চিরন্তনকে দেশের বিভিন্ন বড় বড় শহরে প্রায়ই যেতে হয়। চারবার বিদেশেও ঘুরে আসতে হয়েছে। সংসারের দায়দায়িত্ব সব স্ত্রী জয়িতাই সামলায়। চিরন্তন টাকা দিয়েই খালাস। সারাদিনে অফিসের কাজ সামলে ফ্ল্যাটে ফিরে জয়িতার সঙ্গে বিশেষ কথাও হয় না। ক্লান্ত শরীরে বকবক করতে ইচ্ছেও করে না। জয়িতা বাপের বাড়ির আত্মীয়স্বজনদের কাছে মাঝে মাঝেই যায়। আর বাপের বাড়ির সঙ্গে মোবাইলে কথাবার্তা তো চলেই। এছাড়া টিভি, ম্যাগাজিন এসব তো আছেই। জয়িতা অত্যন্ত মুখচোরা। অন্তর্মুখী স্বভাবের। কথা বলে কম। সব বিষয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে ভালোবাসে। সবচেয়ে বড় কথা, ওর কোনও চাহিদা নেই। অফিসের কোনও পার্টিতে চিরন্তনের সঙ্গে যেতেও চায় না। শুধু একবার চিরন্তন জোর করে জয়িতাকে অফিসের একটা পার্টিতে নিয়ে যেতে রাজি করিয়েছিল। নির্দিষ্ট দিনে জয়িতাকে একটা পার্লারে নিয়ে গিয়ে বয়েজকাট চুল ছাঁটিয়ে মেকআপ করিয়ে এনেছিল। সেই থেকে জয়িতার মাথার চুল বয়েজকাটই রয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন পার্টিতে জয়িতা সঙ্গী হতে না চাওয়ায় মনে মনে বেশ খুশিই চিরন্তন। কারণ ওসব পার্টিতে হাইফাই সোসাইটির মানুষদের কাছে জয়িতার মতো জবুথবু হয়ে থাকা মেয়েকে নিজের বউ বলে পরিচয় দেওয়ার অস্বস্তি থেকেও মুক্তি পেয়ে যায় চিরন্তন। তাছাড়া জয়িতার মতো ল্যাবেন্ডিস মার্কা আনস্মার্ট বউ পাশে উপস্থিত না থাকলে পার্টিটা বেশ জম্পেশ করে এনজয়ও করা যায়।

তিন

তৃষা অফিসে চিরন্তনের পিএ। চিরন্তনের অত্যন্ত আস্থাভাজন এবং দক্ষ কর্মী। চিরন্তন যখন অফিসে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলস ম্যানেজার তখন থেকে দক্ষ কর্মী হিসেবে তৃষা চিরন্তনের অত্যন্ত প্রিয়। চিফ মার্কেটিং ম্যানেজার হওয়ার পর প্রমোশন দিয়ে তৃষাকে নিজের পিএ-র চেয়ারে বসিয়েছে চিরন্তন। তৃষা শুধু কাজে কর্মেই দক্ষ এবং বিচক্ষণই নয়, অফিসের আনাচেকানাচে এবং কোন সাহেবের চেম্বারে কী হচ্ছে না হচ্ছে সেসবের তথ্যতালাশে অত্যন্ত পারদর্শী ফেলুদা।

তৃষার চেহারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় তো বটেই। সেইসঙ্গে কথাবার্তা সাজগোজ এবং চালচলনেও থাকে মাদকতা। তাকে নিয়ে অফিসের অন্য মহিলা কর্মীদের ঈর্ষা এবং বহু পুরুষদের হাহুতাশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। বাড়ি বাটানগরে। অনেকটা দূরের পথ হলেও যতক্ষণ চিরন্তনের অফিসে থাকা ততক্ষণ তৃষারও। পিএ-র ভূমিকা পালনের জন্যে কলকাতার বাইরে মাঝে মাঝে চিরন্তনের সঙ্গে ট্যুরেও যেতে হয়।

চিরন্তনকে বোল্ডআউট করতে খুব বেশি ওভার বল করতে হয়নি তাকে। তৃষা বিয়ে করেনি। তাই ওদের প্রেমলীলা দিব্যি চলছে। অফিসে দু'জনের মধ্যে বস এবং পিএ-র সম্পর্ক। তবে

প্রায়ই হোটেল, রেস্টুরেন্ট বা এদিক-সেদিকে দু'জনে ঘোরে। তবে এ বিষয়ে দু'জনেই খুব সতর্ক থাকে। যেমন, এসব সময়ে চিরন্তন অফিসের বা নিজের গাড়ি কখনও ব্যবহার করে না। সব সময়ই ট্যাক্সি। চিরন্তন কোনও দিনও নিজের ফ্ল্যাটে তৃষাকে আসতে বলেনি। কারণ, একটা আপ্তবাক্য তো সবসময়েই সত্যি। জয়িতা যতই ল্যাবন্ডিস মার্কা হোক কিন্তু স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং তো বটেই? যেখানে সব স্ত্রীদেরই মানসিকতা একই খাতে প্রবহমান।

চার

কাকপক্ষীদের অগোচরে রাখার সবরকম সতর্কতা নিয়ে চিরন্তন-তৃষার এটা তৃতীয় অভিসার। সময়সীমা সাত দিনের। তবে যেদিন বেরনো তার চারদিন আগে থেকে তৃষা অফিস থেকে ছুটিতে। এটা অতিরিক্ত সতর্কতার জন্যে।

সবকিছু ঠিকঠাক করে নেওয়ার দু'দিন আগে চিরন্তন জয়িতাকে জানিয়ে দেয়, দু'দিন পরে তাকে ট্যুরে আন্দামানে পোর্টব্লেয়ারে যেতে হবে। বড় একটা বিজনেস ডিল করতে হবে। কোম্পানির এমডিরই যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁকে ওই সময় যেতে হবে সিঙ্গাপুরে। তাই চিরন্তনকেই যেতে হবে। এমনটা শোনায় জয়িতা অভ্যস্ত। নতুন করে তার কোনও তাপ উত্তাপ বা প্রতিক্রিয়া কিছু হয় না।

পাঁচ

নির্দিষ্ট দিনে দমদম এয়ারপোর্টে দু'জনে মিট করে। ওরা যাবে বাগডোগরা। সেখান থেকে ট্যাক্সিতে উত্তর সিকিম। ওরা ছাড়া আর কোনও প্যাসেঞ্জার নেওয়া চলবে না, এমন শর্তে অনেক বেশি ভাড়া দিয়ে ট্যাক্সি রিজার্ভ করা হয়। ওরা প্রথমে দু'দিন থাকবে উত্তর সিকিমের মানুলে। এরপর তিনদিন ভার্সেতে। দু' জায়গাতেই দু'টি রিসর্টে থাকবে ওরা। প্রায় জনবসতিহীন দু'টি স্পটেই রিসর্ট দু'টি খুব ছোট। ট্যুরিস্টও আসে খুব কম। মানুলের অবস্থান চীন সীমান্তের খুব কাছে। প্রায় নাথুলাপাস ঘেঁষে।

বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে সেবক সেতু পেরিয়ে তিস্তাবাজার, গ্যাংটক হয়ে মানুল পর্যন্ত পুরো রাস্তা অসম্ভব রোমান্টিক। তিস্তাবাজার থেকে রাস্তার একদিকে খাড়া পাহাড়। অন্যদিকে গভীর খাদ। খাদের নীচ দিয়ে তিরতির করে বয়ে চলেছে তিস্তা। মনে হয় কী শান্ত রূপে রয়েছে তিস্তা! কিন্তু তা নয়। তিস্তা রুদ্ররূপেই বয়ে চলেছে। কিন্তু খাদ অনেক গভীর বলে মনে হয় খুব সরু আকৃতিতে বড় বড় বোল্ডারের ওপর দিয়ে চঞ্চলা কিশোরীর মতো নাচতে নাচতে বয়ে চলেছে তিস্তা।

এক জায়গায় ট্যাক্সি দাঁড় করাতেই হয়। তিস্তা ও রঙ্গিত নদীর সঙ্গমস্থল। পাশাপাশি দুই পাহাড় বেয়ে নামছে দুই নদী। তিস্তার জল ঘোলা। রঙ্গিতের জল গাঢ় সবুজ রঙা। রঙ্গিত যেন আপন খেয়ালে পাহাড়ের গা বেয়ে নামার সময় দূর থেকে দেখতে পেয়েছে প্রেমিকা তিস্তাকে। ঝটিতি দিক পরিবর্তন করে রঙ্গিত ছুটে এসে তিস্তার বুকে আছড়ে পড়েছে। এখান থেকে প্রেমিক প্রেমিকা রঙ্গিত তিস্তার যেন পরস্পরকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে একসঙ্গে বয়ে চলা। সঙ্গমরত অবস্থায় থাকলেও কেউ যেন নিজেদের অস্তিত্বকে ভুলতে নারাজ। অনেক উঁচু পাহাড়ের রাস্তা থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায় আলিঙ্গনরত অবস্থায় একই নদীর বাঁদিকে তিস্তার ঘোলাজল। ডানদিকে রঙ্গিতের সবুজ জল একসঙ্গে বয়ে চলেছে। অনেকটা দূর পর্যন্ত এভাবে চলার পর প্রেমিক রঙ্গিত যেন তিস্তার কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে দু'জনে মিলেমিশে একাকার।

ছয়

চিরন্তন-তৃষার গোপন অভিসারের আজ তৃতীয় দিন। গত দু'দিন দারুণ এনজয় করা হয়েছে। আজ সকালে ওরা ব্রেকফাস্ট সেরে রওনা দিয়েছে উত্তর সিকিমেরই ভার্সের দিকে। ভার্সে যেন স্বর্গের রূপ লাবণ্য থেকে ছিঁড়ে পড়া একটা টুকরো। লোকজনের সাড়াশব্দ প্রায় নেই। শুধু পাহাড় গায়ের ফুলের জলসায় অবিরাম চলে ঝাঁক ঝাঁক পাখিদের কিচিরমিচির। পাখির দলের উড়ে আসা যাওয়া। হঠাৎ হঠাৎ কোনও গাছে দেখা যায় দু'টি পাখি নিভৃতে রয়েছে দু'জনে। এক জায়গায় পাহাড়ের গা থেকে কিছুটা নীচে টিলার মতো সামান্য সমতল। সেখানে অসাধারণ শৈল্পিক রূপের কাঠের একটা ছোট্ট কটেজ। এখানেই ওদের থাকার বুকিং। কটেজে ঢোকার আগে রাস্তা থেকে চিরন্তন-তৃষা চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখছে। একদিকে দৃষ্টি ফেলতেই মনে হতে থাকে, না না এদিকটায় নয়। বরং ওদিকটা দেখি। হয়তো ওদিকটা আরও বেশি মোহময়।

পাহাড়ের প্রধান সড়ক থেকে বেশ অনেকটা নীচে এই টিলা। প্রধান সড়ক থেকে একটি গাড়ি চলাচলের মতো নুড়ি বিছানো সংকীর্ণ রাস্তা নেমে গেছে টিলা পর্যন্ত। রিসর্টের সামনে একটি ট্যাক্সি প্রধান সড়কে ওঠার জন্যে তৈরি। ট্যাক্সিটা ওপরে না ওঠা পর্যন্ত চিরন্তনদের ট্যাক্সি প্রধান সড়কে দাঁড়িয়েই থাকবে। তাই ড্রাইভার চিরন্তনদের বলে ট্যাক্সি থেকে নেমে যায়।

আচমকা তৃষার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর, 'এ কী? এই মেয়েধরাটা আবার এখানে কেন?' ততক্ষণে চিরন্তনও দেখেছে। অফিসে ওর অনেকটা অধীনস্থ অ্যাসিস্ট্যান্ট পারচেজ অফিসার বিশ্বজিৎকে। কোনও নারী পটাতে ওর যথেষ্ট দুর্নাম। আতঙ্কের গলায় তৃষা, 'কী হবে? ও যদি আমাদের দেখে ফেলে? তাহলে অফিসে ঠিক চাউর করে দেবে।'

—মাথা নিচু করে থাক। যেন আমাদের দেখতে না পায়। মনে হচ্ছে ওই ট্যাক্সিটায় ও ফিরবে।

—ও কেন? বল ওরা। ওই মেয়েধরাটা কখনও একা নয়, নিশ্চয়ই সঙ্গে কোনও মেয়ে আছে।

—ওদিকে তাকিও না। যেন আমাদের দেখতে না পায়।

—ঔৎসুক্যের গলায় তৃষা, 'কাকে নিয়ে এসেছে সেটা জানার চেষ্টা করব না? যদি অফিসের কেউ হয়?'

—দরকার কী তোমার? এখানে আমাদের দেখলে কিন্তু সর্বনাশ। ঔৎসুক্য কিন্তু ছাড়তে পারছে না তৃষা। একটু পরেই তৃষার চাপা গলা, 'এটা তো দুর্দান্ত আমদানি করেছে? আগে তো মেয়েধরাটার সঙ্গে একে কখনও দেখিনি? আমাদের অফিসের বাইরের কেউ। পেন্সিল হাই হিল জুতো কালো জিন্স। লাল টপ। মাথায় সানগ্লাস। সোয়েটারটা কোমরে বাঁধা।'

চাপা ধমকের গলায় চিরন্তন, 'তুমি না একটা সর্বনাশ না করে ছাড়বে না? বলছি মাথা নিচু করে রাখতে। কিছুতেই শুনছ না।'

—আমি খুব সাবধানেই থাকছি। একবার মুখটা একটু তুলে দেখিই না।

খুব সন্তর্পণে একটু মুখ তুলে তাকাতেই চিরন্তনের মুখ আমসি। চটুল গলায় তৃষা, 'কী হল? চেন নাকি মালটাকে?'

চাপা আর্তনাদের গলায়, চিঁচিঁ কণ্ঠস্বরে চিরন্তনের মুখ থেকে বেরল, 'জয়িতা, আমার বউ।'

অলঙ্করণ : সুব্রত মাজী

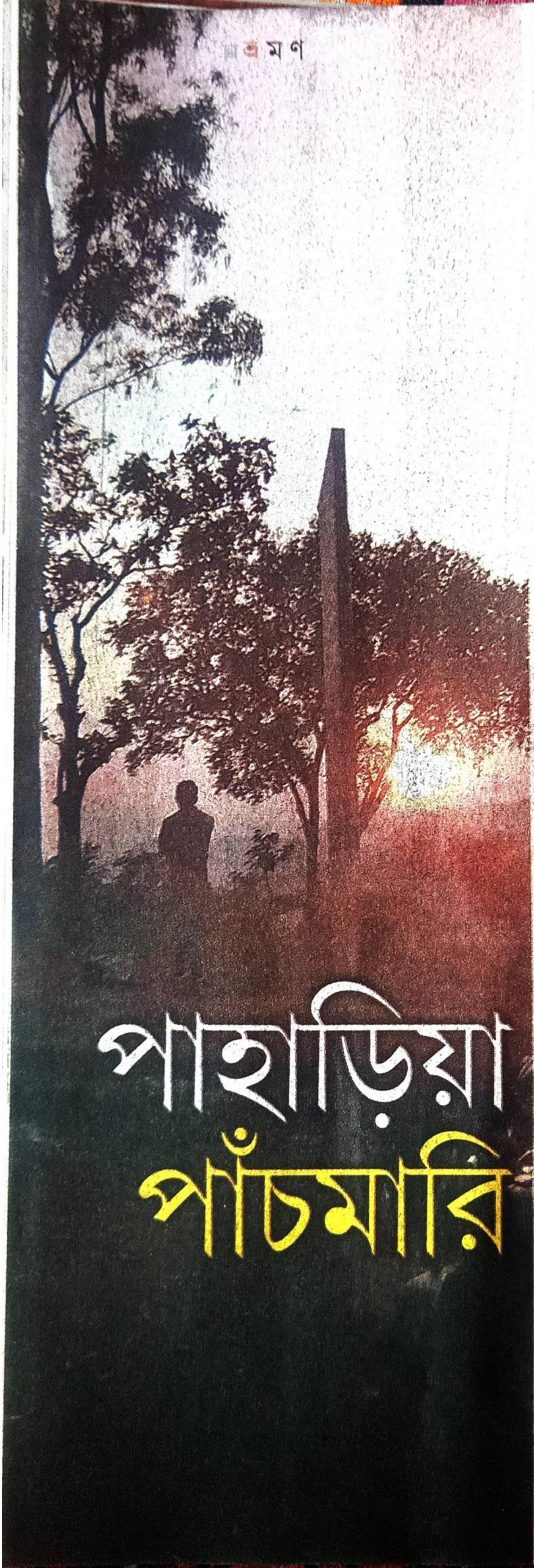

পাহাড়িয়া পাঁচমারি

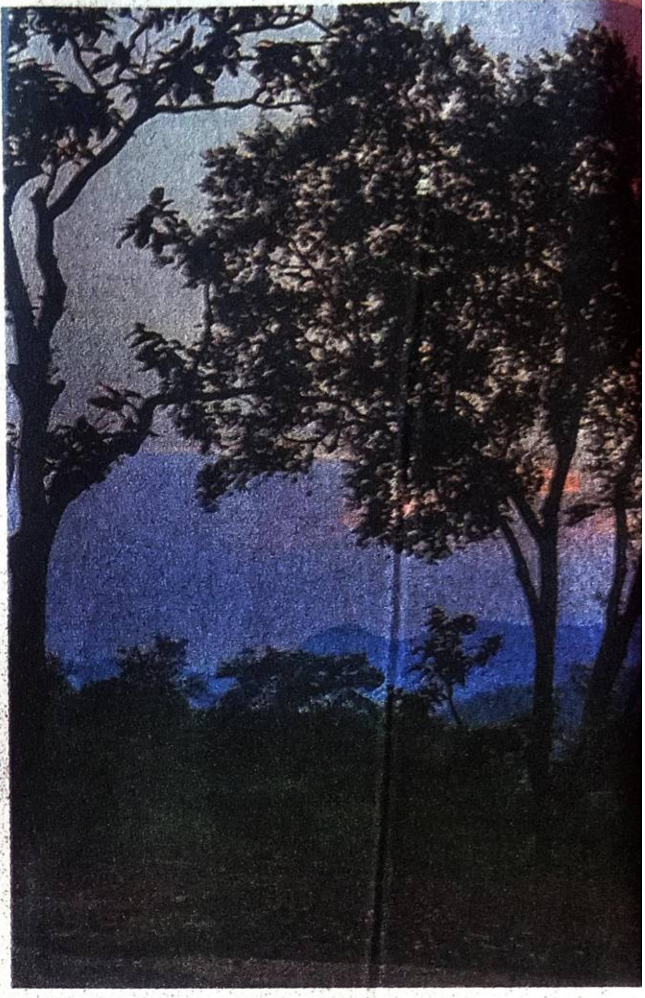

অর্পণ রায়চৌধুরী

বর্ষার দিনে মেঘ মল্লারে বাদলের গান আর ভেজা হাওয়ায় যেন পালাই পালাই সুর। ঘোর শ্রাবণে অচেনার আনন্দ খুঁজতে তাই বেরিয়ে পড়ি 'সাতপুরার রানি' পাঁচমারির উদ্দেশে। পুরাকালে এই শহর নাকি ডুবে ছিল জলের তলায়। দ্বাপরে ছিল পাণ্ডবদের সাময়িক অরণ্য আবাস। পরবর্তীকালে কোরকু আদিবাসী অধ্যুষিত এই শৈল শহর হয়ে ওঠে ব্রিটিশের নয়নের মণি। তারা পাঁচমারিকে গড়ে তোলে সেন্ট্রাল প্রভিন্সের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী রূপে। আসলে সাতপুরা পর্বতের স্নেহ ছায়ায় ঘেরা পাঁচমারি বরাবরই ঘোর রহস্য সুন্দরী।

পিপারিয়া-পাঁচমারি রাস্তায় মটকুলি, পোগারা বস্তি পেরতেই অরণ্যের ছায়া মাখা প্রাণ জুড়ানো পথ। ফলকে ফলকে সতর্কবার্তা— 'আমরা সাতপুরা ন্যাশনাল পার্কে ঢুকে পড়েছি, যে কোনও সময় বন্যপ্রাণীর মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।' দুটো হরিণ আর একদল বানর ছাড়া অবশ্য আমাদের ভাগ্যে আর কিছুই জোটেনি। পাঁচমারি পৌঁছলাম মেঘলা দিনের অলসবেলায়। পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা বেশ

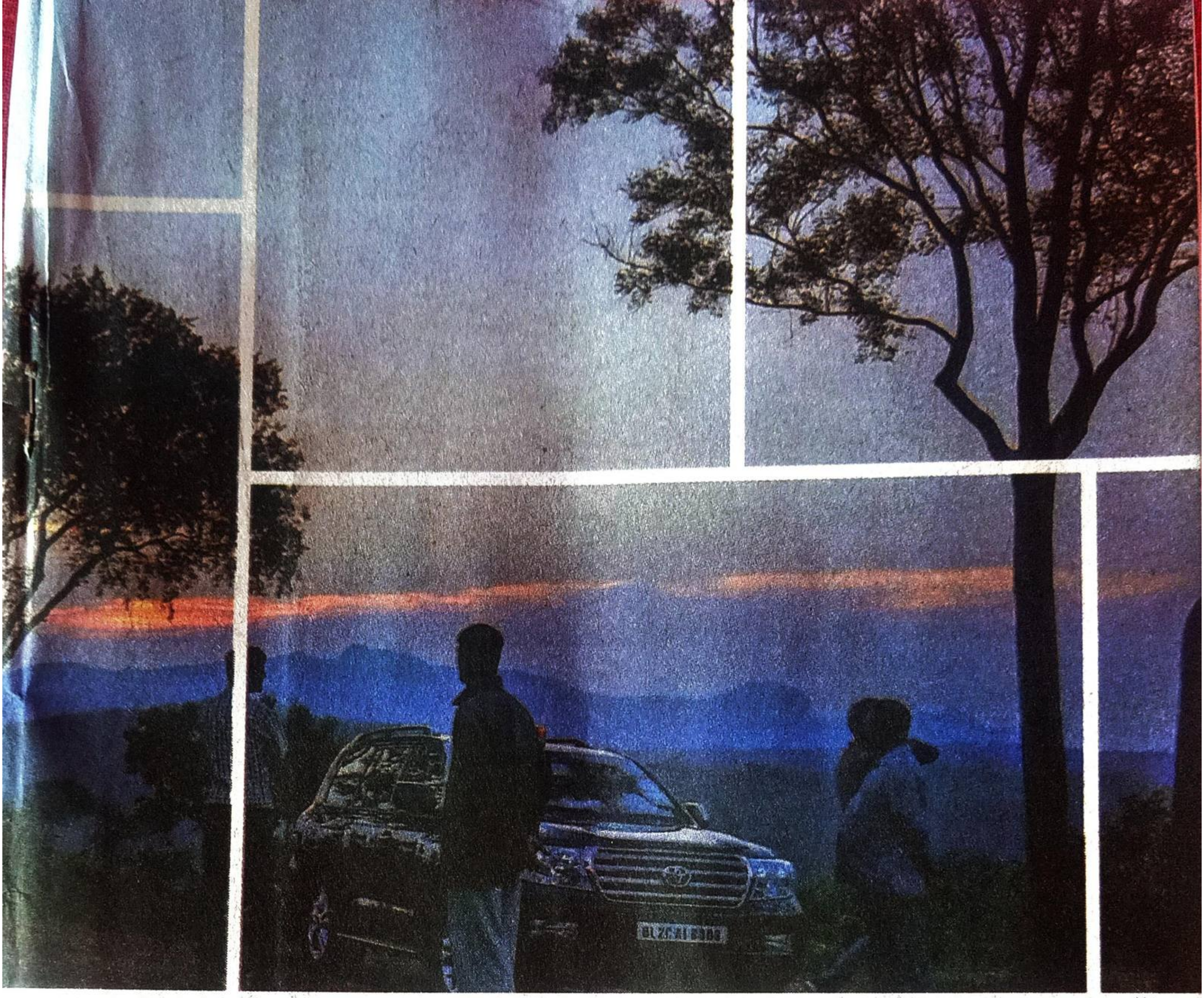

রাজেন্দ্রগিরি পার্ক

সাহেবি কেতার শহর। পরিচ্ছন্ন চওড়া রাস্তাঘাট। ছোট্ট বাজার। অনেকখানি জায়গা জোড়া সুসজ্জিত, বাগানওয়ালা ব্রিটিশ আমলের সব বাংলো বাড়ি। পাঁচমারির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এখন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের হাতে। শহরে ঢুকতেই সেনাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। মধ্যপ্রদেশ পর্যটন বিভাগের রিসর্টে আমাদের সাময়িক আস্তানা। গাছগাছালি ভরা সুবিশাল বাগানের মাঝে ছোট ছোট কটেজ। সামনের লনে রঙ্গন, জুঁই, জিনিয়ার মিষ্টি হাসি। সবুজ ঘাসে পা ডুবিয়ে চড়াই, চন্দনা আর বুলবুলিদের কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে দিনের আলো বিদায় নিল। অন্ধকার নামার আগে ঘরে ফিরতে হল হনুমানের দৌরাত্ম্যে। ছাদে ছাদে তাদের ধুপধাপ, ঝুপঝাপ, চিঁহিঁচিঁহি শব্দে গা ছমছমে আবহ।

সকালবেলায় জিপসিতে চড়ে একটু ঘোরাঘুরি। এখানে ঘুরতে হলে জিপসি ভাড়া করাটাই দস্তুর। পাঁচমারি শহর এলাকাটুকু বাদ দিয়ে বাকিটা জাতীয় উদ্যানের অন্তর্গত। বোরি ও পাঁচমারি অভয়ারণ্য আর সাতপুরা জাতীয় উদ্যান নিয়ে জঙ্গলের বিস্তার। চিরহরিৎ বৃক্ষের এই অরণ্য জাতীয় উদ্যানের স্বীকৃতি পায় ১৯৮১ সালে। উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত পক্ষীবিদ সেলিম আলি। শাল, সেগুন,আমলকী, শিমুলে ছাওয়া ৫২৪ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত অরণ্য বাঘ, গাউর, বাইসন, চিতা, হরিণ, নীলগাই, শ্লথ ভালুক, বুনো কুকুরদের বিচরণ ভূমি। শহরের আশপাশে ন্যাশনাল পার্কের ভেতরে দর্শনীয় স্থানগুলি হল— বি-ফলস, রজতপ্রপাত, অপ্সরা বিহার, ডাচেস ফলস, রিচগড়, আইরিন পুল, ধুপগড়। এগুলি দেখতে প্রবেশমূল্য লাগে। আজ সকাল থেকে আকাশ পরিষ্কার। ঝকঝকে রোদ উঠেছে। গরম কিন্তু নেই। সারাক্ষণ এখানে বয়ে চলা বাতাসে থাকে হিমের পরশ। সাতপুরার উত্তর ঢালে ১ হাজার ১০০ মিটার উচ্চতায় মধ্যপ্রদেশের এই একমাত্র পাহাড়ি শহরের সঙ্গে তাই সারা বছরই পর্যটকদের বন্ধুত্ব। আঁকাবাঁকা মেঠো জংলা পথ ধরে পৌঁছলাম দেনওয়া নদীর বিখ্যাত খাত ‘হান্ডি খোহ’ বা ‘আঁধি খোহ’তে। প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু দু’টি খাড়া পাহাড়ের নীচে অন্ধকূপের মতো নদীখাত, তাই নাম ‘অন্ধিখোহ’। সেখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে দেনওয়া নদী। জঙ্গলের আড়ালে প্রায় দেখাই যায় না। দূর পাহাড়ের মাথায় চৌরাগড় মন্দিরের চূড়ার আভাস। লোকবিশ্বাস, বহুকাল আগে এখানে ছিল বিশাল এক জলাশয়। সেখানে ছিল অসুররূপী ভয়ঙ্কর এক সাপের বাস। মহাদেব পাহাড়ে ভক্তরা এলে সে তাদের ভীষণ ভয় দেখাত। এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ মহাদেব ত্রিশূল ছুড়ে মারেন সাপটিকে। সে বন্দি হল

পাণ্ডব কেতন

পাথরে। প্রচণ্ড ক্রোধে দেবাদিদেবের ত্রিনয়ন জ্বলে উঠেছিল। আর তাতেই শুকিয়ে গেল ওই সরোবর। সৃষ্টি হল ভয়াবহ এই খাদ। হাঁড়ির মতো দেখতে বলে এর নাম 'হান্ডিখোহ'।

ফরসিথ বা প্রিয়দর্শিনী পয়েন্ট দেখতে বেশ কিছুটা হেঁটে উঠতে হয়। এখানে দাঁড়িয়েই ফরসিথ সাহেব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পাঁচমারির প্রেমে পড়েন। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় অনেক বিদ্রোহী গোন্ড, কোরকু, মাওয়াসি, বোরি আদিবাসী অধ্যুষিত পাঁচমারির জঙ্গল ও গুহায় আত্মগোপন করে। স্থানীয়দের মনে স্বদেশিয়ানা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁদের খোঁজেই বাংলার ল্যান্সারদের ক্যাপ্টেন জে ফরসিথ সেনাবাহিনী নিয়ে এখানে এসেছিলেন। ঝাঁসি যাওয়ার পথে জব্বলপুর থেকে রওনা হয়ে তিনি পৌঁছন হোসাঙ্গাবাদ আর ছিন্দওয়ারার সীমানায়, পাহাড়ের নীচে। তারপর কঠিন রাস্তা ধরে পাহাড়ে চড়তে শুরু করেন। উপরে উঠে এখানকার গাছপালা ঘেরা সবুজ প্রকৃতি দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। মনে পড়ে যায় ইংল্যান্ডের কথা। মাথায় ওঠে বিদ্রোহীদের খোঁজার কাজ। ১৮৬২ সালে তিনি বসবাসের জন্য যে বাড়িটি প্রথম নির্মাণ করেন, তার নাম 'বাইসন লজ'। পরবর্তীকালে এখানে শৈলাবাস ও স্বাস্থ্যাবাস নির্মাণে ব্রতী হন। যেখান থেকে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন ফরসিথ পাঁচমারির শোভা দেখে প্রথম মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেই জায়গাটিই ফরসিথ পয়েন্ট নামে পরিচিত হল। অসাধারণ এই স্পট। সাতপুরার মৈকাল পর্বতশ্রেণির দিগন্ত জোড়া বিস্তার। নীল সবুজের মিলনে সে এক রঙিন তেপান্তর। বহু নীচে খাদে জঙ্গলের আভাস। এখানেও বাঁয়ে দূর পাহাড়ের মাথায় দেখা যায় চৌরাগড় শিব মন্দিরের আবছা কায়া। খেয়ালি মেঘের দস্যিপনায় রোদভাসা পাহাড়ের পাশেই পলাতকা ছায়া। ইন্দিরা গান্ধীর বড় প্রিয় ছিল এই স্থান। তাঁরই স্মরণে 'ফরসিথ পয়েন্ট' এখন 'প্রিয়দর্শনী পয়েন্ট' নামে পরিচিত।

সাতপুরার দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ মহাদেব পর্বতের (১৩৩০ মিটার) পাদদেশে গুপ্ত মহাদেব যাওয়ার পথেই গাড়িচালক সাবধান করে দিলেন, সেখানে হনুমানের উপদ্রব প্রবল। গাড়ি থেকে নেমে জঙ্গলের পথ ধরে বেশ কিছুটা রাস্তা হাঁটতে হয়। বনময় মহাদেব পর্বতের গা-ঘেঁষা সংকীর্ণপথ। আরেক দিকের খাদে নাম না জানা নির্ঝরণীর বয়ে চলার শব্দ। হঠাৎ হঠাৎ হনুমানের লম্ফঝম্ফে ভয় জাগানো মুহূর্ত। প্রায় ৫০ ফুট লম্বা অন্ধকার এক পাহাড়ের ফাটলের বাইরে কমলারঙা অতিকায় এক বীর হনুমানের মূর্তি জানান দিল এসে গিয়েছি গুপ্ত মহাদেব গুহায়। বেশ কষ্ট করে কাত হয়ে ঢুকতে হয় গর্ভমন্দিরে। একসঙ্গে পাঁচ জনের বেশি দাঁড়ানো যায় না। গা ছমছমে অন্ধকার অপরিসর স্ট্যালাগমাইট গুহায় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ও পার্বতীর প্রাকৃতিক প্রতিরূপ। ভস্মাসুরের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে এই গুহাতেই লুকিয়ে ছিলেন শূলপাণি। রাক্ষস ভস্মাসুর ছিল শিবের ভক্ত। কঠিন তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করে বর পেয়েছিল, ভস্মাসুর যার মাথায় হাত দেবে, সে ভস্ম হয়ে যাবে। একদিন হঠাৎ সে পার্বতীর দেখা পেয়ে তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে স্থির করে, মহাদেবকে ভস্ম করে পার্বতীকে বিয়ে করবে। পরিকল্পনা মাফিক শিবের মাথায় হাত দিয়ে ভস্ম করতে গেলে ভীত-সন্ত্রস্ত মহাদেব ছুটতে ছুটতে এই গুহায় এসে লুকিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেন। সেই থেকে এর নাম হয় গুপ্ত মহাদেব গুহা। ভস্মাসুরের পরিণতি যথারীতি হাস্যকর। শিবের দুরাবস্থা দেখে পার্বতী ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। সব শুনে শ্রীবিষ্ণু যোগবলে পার্বতীর রূপ ধারণ করে ভস্মাসুরের কাছে হাজির হয়ে প্রেম নিবেদন করেন। ভস্মাসুর পার্বতীরূপী শ্রীবিষ্ণুকে নিয়ে যায় নিজের বাড়িতে। এরপর পার্বতীরূপী শ্রীবিষ্ণু ভস্মাসুরকে বললেন, 'আমাকে স্ত্রী হিসাবে পেতে হলে আমার সঙ্গে নাচতে হবে। আর আমি যা করব তা তোমাকেও করতে হবে।' এ আর এমনকী কথা! ভস্মাসুর তো একথায় রাজি। শুরু হল নাচ। জমে উঠল মৌতাত। নাচতে নাচতে শ্রীবিষ্ণু নিজের মাথায় হাত ঠেকালেন। দেখাদেখি ভস্মাসুরও তা করতে গেলে সে নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। রক্ষা পেলেন ভোলা মহেশ্বর।

গুপ্ত মহাদেব থেকেই অরণ্যপথে সাড়ে তিন কিমি হেঁটে,

তারপর ১ হাজার ৩৬০টি সিঁড়ি ভেঙে পৌঁছনো যায় সাতপুরার তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ চৌরাগড় শিব মন্দিরে। জাগ্রত এই মন্দিরে আছে হাজার হাজার ত্রিশূল। তার মধ্যে কয়েকটা পাঁচ মিটারেরও বেশি লম্বা আর তিন টনের চেয়েও বেশি ভারী। ভক্তদের বিশ্বাস, এ মন্দিরে ত্রিশূল দান করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। শিবরাত্রিতে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। সিপাহি বিদ্রোহের সময় চৌরাগড়ে বসেই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে ছিলেন নাগপুরের মহারাজ আপ্পাসাহিব ভোঁসলে। মন্দিরের পথ দুর্গম না হলেও কষ্টকর। ছোটদের নিয়ে যাওয়া তাই সম্ভব হয়নি।

গুপ্ত মহাদেব থেকে একটু গিয়েই 'মধ্যপ্রদেশের অমরনাথ' নামে খ্যাত বড়া মহাদেব গুহা। মহাদেব স্বয়ং নাকি এই গুহায় তপস্যা করেছিলেন। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে বেশ খানিকটা উঠতে হয়। স্যাঁতসেঁতে সুবৃহৎ এক গুহায় রেলিং ঘেরা প্রস্রবণ। কুণ্ডের মাঝখানে কষ্টি পাথরের বিরাট শিবলিঙ্গ ছাদ দিয়ে চুইয়ে পড়া জলে সিক্ত। বিষ্ণুপুরাণ মতে, এখানে মহাদেব বামাসুরকে বধ করেছিলেন। এই পাহাড়ের পূর্বদিকের গুহায় মেসোলিথিক আমলের চিত্রকলা পাওয়া গিয়েছে। আমাদের অবশ্য তা দেখা হয়নি।

দুপুরের খাওয়া সেরে এলাম বাসস্ট্যান্ড থেকে দেড় কিমি দূরে প্রখ্যাত জটাশঙ্করের রহস্য গুহায়। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে নীচে। এই সিঁড়ি নির্মাণ হয়েছে কয়েক বছর আগে। আগে নামতে হতো পাথর বেয়ে সুঁড়িপথ ধরে। ভস্মাসুরের ভয়ে পালাতে গিয়ে মহাদেবের জটা পড়েছিল এখানে। সেই থেকে নাম জটাশঙ্কর। পুজোর সামগ্রী আর ভেষজ ওষুধ নিয়ে বসা একসারি দোকান পেরিয়ে, হনুমান মন্দিরের পাশ দিয়ে ঢালু রাস্তা ধরে নীচে নামার পালা। পাশের মন্দিরে দু'টি পাথর ভাসছে জলে। জনশ্রুতি, এই পাথর নাকি রামায়ণের সেই সেতুবন্ধের পাথর! সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে যেন পাতালে প্রবেশ করা! মাথার উপর দুই পাহাড়ের ফাঁকে এক চিলতে মেঘলা আকাশ। একেবারে নীচে চাতালের সামনে গুহার বিশাল খোলা মুখ। প্রবেশপথে অষ্টধাতুর বিরল একটি ত্রিশূল গাঁথা। প্রবেশ করলাম গুহায়। ভিতরটা মিশমিশে অন্ধকার। সোজা হয়ে দাঁড়ালেই মাথায় ছাদ ঠেকে। ভেতর থেকে বাইরে তাকিয়ে গুহামুখকে পঞ্চনাগের মাথা বলে মনে হয়। পায়ের নীচে জল। জম্বুদ্বীপের ঝর্ণার এই জলধারায় ডুবে রয়েছে অসংখ্য ছোটবড় শিবলিঙ্গ। একটু উঁচুতে জটাশঙ্কর। গোলাপি পাথরের জটা ধূপের ধোঁয়া, দীপের আলোয় রীতিমতো রহস্যময়। স্পর্শে বাধা নেই। মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম সেরে নকুলদানা প্রসাদ হাতে আবার খোলা আকাশের শামিয়ানায়।

ফিরতি পথে ভেষজের দোকানে খানিক দাঁড়াই। অবাক হয়ে দেখি, দুই থেকে পাঁচ কিলো ওজনের এক-একটা পেঁয়াজ! অদ্ভুত দর্শন সব উদ্ভিদ, ফল। লক্ষ্মণ মূলের সুমিষ্ট স্বাদ চেখে আর নানান ভেষজ তেলের সুগার, প্রেশার কমানো, কোমরে ব্যথা সরানো আর জড়িবুটি শিকড়ের সাপ তাড়ানোর ক্ষমতা প্রভৃতি নানান গুণকীর্তন শুনে কিনব কী কিনব না, এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে ভুগতে আবার এগিয়ে চলা।

বিকেল শেষে রাজেন্দ্রগিরি ভিউ পয়েন্টে পৌঁছলাম। ঢুকে পড়লাম ফুলে ফুলে ভরা এক সুন্দর বাগিচায়। স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের বড় প্রিয় ছিল এই পাহাড়।

ক্ষিতিশঙ্কর মল্লিক

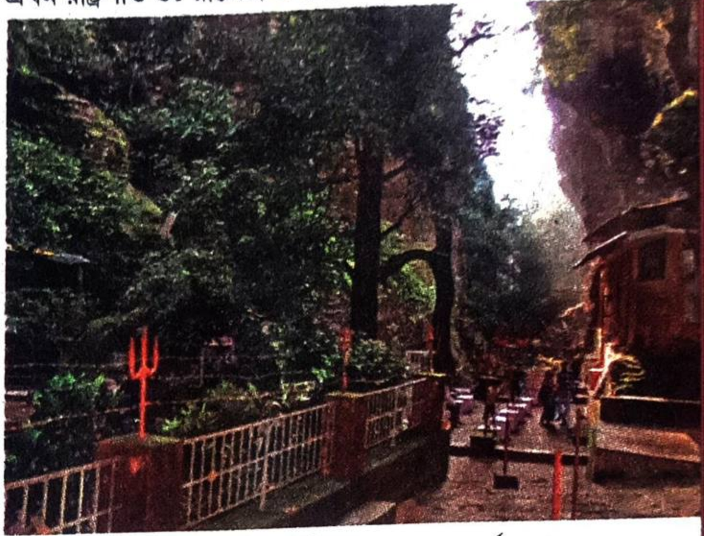

বাগানের মাঝে রয়েছে তাঁর মূর্তি। এখান থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্য ভারী মনোরম। ফিরতি পথের ধারে আরও একটি স্পট 'পাঁচমারি লেক'-এ আর নামলাম না। তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তারপর সারারাত বাদল ঝরা বর্ষারাতের শাওনগীতি।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল সেনা প্রশিক্ষণ শিবির থেকে ভেসে আসা ব্যাগ পাইপের সুরে। জলখাবার শেষ না হতেই গাড়ি হাজির। আজ বৃষ্টিধোয়া মেঘলা সকাল। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশদের তৈরি ইউরোপীয়

বিহারের সিমলা
শিমুলতলায়
'আরাধনা রিসর্ট'
বিশেষ ছাড়!
in GROUP TOUR
for SENIOR CITIZEN
(Long stay with Spl. Care)
শীতের বুকিং চলিতেছে
70446 93856
www.aradhanaresort.com

জয় জগন্নাথ
follow us on
নিউ সি হক (পুরী)
We have no connection with Hotel Sea Hawk Digha
Ph.(06752) 231500,8895295238,9827211439
E-mail: hotelnewseahawk@yahoo.co.in
www.hotelnewseahawk.com
পুলিন পুরী (পুরী)
Ph.(06752) 222360,9861928929, 7653018543
E-mail: hotelpulinpuri@yahoo.com
www.hotelpulinpuri.com
Kolkata Booking Office
48A,Dr.Sundari Mohon Avenue,1st Floor (opp.Ladies Park)
Kol:700 014, Ph:(033) 2239 7578 460 22458,9007857627, 9831289141

DIAMOND
TOURS & TRAVELS
AYODHYA, VARANASI,
PRAYAGRAJ
Discover The Divine Topestry
4NIGHT
5DAYS
BOOK A TRIP NOW
8910502743, 9038083001

রঙিন কাচের নকশা ও দেবদূতের প্রকৃতিওয়ালা কারুকার্যময় ছাদের ক্রাইস্ট চার্চ দেখে পৌঁছলাম 'বাইসন লজে'। এখানে বসবাসের জন্য এই বাড়িটিই ফরসিথ সাহেব প্রথম নির্মাণ করেন। ক্রিমরঙা দেওয়াল ও সবুজ ছাদের 'বাইসন লজ' এখন সাতপুরা ন্যাশনাল পার্কের কার্যালয় ও প্রকৃতি সংগ্রহশালা। সেখানে এই অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীর সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা নিয়ে রওনা হলাম পাণ্ডবগুহার পথে।

'পাঁচমারি' নামটি তো এসেছে 'পাঁচমারা' অর্থাৎ পাঁচটি গুহা থেকে। কথিত আছে,অজ্ঞাতবাসকালে পঞ্চপাণ্ডব নাকি লুকিয়ে ছিলেন ওই গুহায়। বাইরের ফলক যদিও বলে এগুলি চতুর্দশ খ্রিস্টাব্দের বিহারধর্মী বৌদ্ধগুহা। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা থাকতেন এখানে। 'The Highlands Of Central India' বইতে ক্যাপ্টেন ফরসিথ লিখেছেন, 'পাঁচমারিতে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করতেন। হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণের সময় তাঁরা চলে যান। পরিত্যক্ত হয় গুহা।'

ফুলে ফুলে ভরা সাজানো বাগানের শেষে এক অনুচ্চ টিলায় পরপর পাঁচটি গুহা। সবচেয়ে সুন্দর ও আলোকিত গুহাটি দ্রৌপদীর। আর অন্ধকার ছোট গুহায় থাকতেন ভীম। গুহার ভেতরে পাথরের তাক, বালিশ। পাণ্ডবগুহা বর্তমানে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত।

পাঁচমারি শুধু তো গুহার দেশ নয়, ঝর্ণারও দেশ। বিশেষত এই বর্ষাকালে। নানান রূপের অজস্র ঝর্ণা আলপনা এঁকেছে পাঁচমারির সবুজ পাহাড় জুড়ে। পাণ্ডবগুহা থেকে গাড়ি পাকা রাস্তা ছেড়ে ঢুকে পড়েছে উত্তর-পশ্চিমের মোরামমাখা আলোছায়ার পথে। তারপর কিছুটা হেঁটে অপ্সরা বিহার জলপ্রপাত ও পাঞ্চালি কুণ্ড, দুটোই কাছাকাছি। ঘন জঙ্গলের গা বেয়ে কয়েকশো ফুট নীচে ঝাঁপিয়ে পড়া জলধারার গর্জন। চতুর্দিকে পাহাড়, বাতাসে জঙ্গলের ঘ্রাণ। পরিবেশ মায়াময়। সত্যিই বুঝি স্বর্গের অপ্সরাদের বিচরণক্ষেত্র! পাঞ্চালি কুণ্ডের জলধারা পাঁচভাগে বিভক্ত। অপ্সরা বিহার থেকে আধ কিমি দূরে রজতপ্রপাত। অপ্সরা বিহার ও পাঞ্চালি কুণ্ডের জলধারাই জলপ্রপাতের রূপ নিয়েছে পাঁচমারির উচ্চতম জলপ্রপাত রজতপ্রপাতে। সেখানে যেতে বেশ কিছুটা হাঁটতে হয়। ধূসর পাথর ও শ্যামল বনানীর মাঝে পাঁচশো ফুট উপর থেকে ঝরে পড়া জলরাশি যেন গলানো রুপো! তাই তো নাম রজতপ্রপাত। তবে পাঁচমারির সবচেয়ে সুন্দর ঝর্ণা হল 'যমুনাপ্রপাত' বা 'বি-ফলস'। শহর থেকে তিন কিমি দূরে আদিম জঙ্গলের ঘেরাটোপে থাকা এই প্রপাতকে যদিও রেলিং ঘেরা জায়গায় দাঁড়িয়ে উপর থেকে দেখা যায়। কিন্তু নীচে নেমে না দেখলে যে তার রূপের বাহার অদেখাই থেকে যায়। তাই আমরা নদীর উপর সেতু পেরিয়ে সিঁড়িপথ ধরলাম। শ্যাওলাধরা পাথরের সিঁড়ি পাহাড় পেঁচিয়ে নেমে গিয়েছে কোন অতলে। পাখিদের কলতান আর ঝর্ণার গানে বর্ষার অলস মধ্যাহ্নে যেন বিঠোফেনের সিম্ফনি। নীচ থেকে যমুনাপ্রপাতের রূপ সত্যিই অতুলনীয়! সেখানে জলকণার রামধনু রং। চোখ বুজে, কান পেতে শুনলে জলপ্রপাতের ঝরে পড়ার শব্দ মৌমাছির গুঞ্জন বলে ভ্রম হয়। তাই এর আরেক নাম 'বি ফলস'। আছে আরও এক সুন্দরী জলপ্রপাত— 'ডাচেস ফলস' বা 'জলাবতরণ'।

'বি-ফলস'থেকে রওনা হয়ে মোটরপথের শেষে চার কিমির এক তীব্র উতরাই পথ পেরতে হয়। তারপর ঘন জঙ্গলের শুঁড়িপথ ধরে বেশ কিছুটা হেঁটে পৌঁছনো যায় 'ডাচেস ফলস'-এ। একশো মিটার উঁচু থেকে বাঁধনহারা উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়া জলরাশির গর্জনে মুখর বনভূমি। ওই 'ডাচেস ফলস' থেকে অরণ্যপথে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তিন কিমি হেঁটে চলে যাওয়া যায় জম্বু দ্বীপের জলধারা দিয়ে সৃষ্ট অদ্ভুত সুন্দর 'সুন্দরকুণ্ডে'। সেখানে স্নানে আরাম মেলে। তবে জলাশয় অত্যন্ত গভীর। যাওয়ার পথও বিপজ্জনক। ফেরার পথে ডানদিকের উত্তরমুখী পথে হেঁটে দেখে নেওয়া যায় 'দ্রৌপদী দ্বীপ', 'ভ্রান্তনীর' ও 'লাফিং হিল'। 'ভ্রান্তনীর'-এ ঝর্ণা ছাড়াও আছে প্রাগৈতিহাসিক গুহা। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৩০ সালে আদিম মানুষের ব্যবহৃত তৈজসপাত্রসহ গুহাটি আবিষ্কার করে। গুহায় আছে চমৎকার চিত্রকলা। বিশেষ করে যুদ্ধ, শিকার ও নৃত্যের রঙিন ছবিগুলো দেখবার মতো। পাঁচমারির ঝর্ণা ও বিখ্যাত কুণ্ডের মধ্যে রয়েছে— 'ত্রিধারা', 'বনশ্রী বিহার', 'সিঙ্গাম' ও 'রামাইয়া কুণ্ড'।

সময়ের অভাবে এবার যাওয়া হয়ে উঠল না 'মান্দাদেও গুহা'তে। পাঁচমারির ভূখণ্ড যে কত প্রাচীন তা বোঝা যায় 'মান্দাদেও গুহা'য় এলে। ভীমভেটকার মতো সেখানে আছে প্রাগৈতিহাসিক গুহামানবের চিত্রকলা। যা প্রায় আট হাজার বছরের পুরনো বলে মনে করা হয়। ১৫০ ফুট লম্বা, ২০ ফুট চওড়া, ১০০ ফুট উঁচু সেই গুহা।

পাঁচমারির গুহাগুলি জুড়ে আছে নানান চিত্রকলা। যেমন— জটাশঙ্করের কাছে 'হাপরিস কেভ'-এ এক পুরুষকে

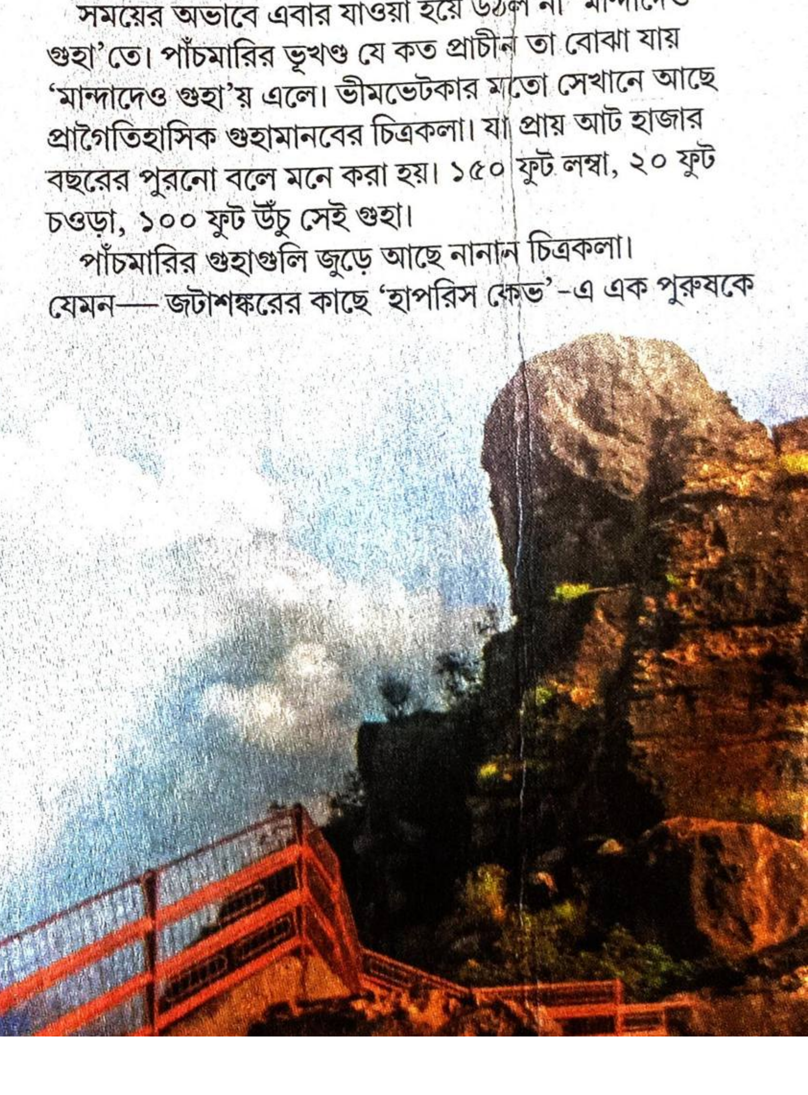

প্রিয়দর্শিনী পয়েন্ট

ঘিরে তিন মহিলা ও এক শিশুর নৃত্যচিত্র দেখবার মতো। পাঁচমারি-পিপারিয়া রোডে জম্বুদ্বীপের পরপর ছয়টি গুহায় ও 'অস্তাচলে'-র পাথুরে গুহায় মানবচিত্রের পাশাপাশি আছে নানান জন্তু-জানোয়ারের ছবি। আবার ধুপগড়ের দিকে 'ডরোথি ডিপ'-এ আছে ঘোড়সওয়ার ও রাক্ষস রূপী নানান প্রাণীর দৃশ্য। শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে 'রজতপ্রতাপ' গুহায় মাছ ও মধু সংগ্রহের চিত্র, কুমির শিকারের পর আদিবাসীদের নৃত্য উৎসবের চিত্রগুলি অসাধারণ। পাঁচমারির গুহাচিত্রগুলি দেখতে হলে আস্ত একটা দিন বরাদ্দ রাখতেই হবে।

বেশ গুরুপাক মধ্যাহ্নভোজ সেরে এবার 'রিচগড়ে'-র পথে। গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা পথ হাঁটতে হয়। চিরসবুজ শাল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আলোছায়ার ডোরাকাটা রাস্তা। গাছে গাছে ফিঙে, ময়না, তিতিরের দ্বিপ্রাহরিক জলসা। রংবেরঙের প্রজাপতির নিশ্চিন্ত উড়ান। দাঁড়ালাম সুবিশাল পাহাড়ের নীচে এক ন্যাচারাল অ্যাম্ফিথিয়েটার কেভের সামনে। একে 'ভালুকগুহা'-ও বলে।

এখান থেকে কিছুটা হেঁটে যাওয়া যায় অপার শান্তির জায়গা 'রামাইয়া কুণ্ড' বা 'আইরিন পুল'-এ। জাস্টিস ভিভিয়ান বসুর স্ত্রী আইরিন বসু এটি আবিষ্কার করেন। সবুজ অরণ্যের মাঝে টলটলে নীল জলের হ্রদ দেখলেই স্নানের ইচ্ছে জাগে।

রিচগড় থেকে দুপুর শেষে রওনা হলাম শহর থেকে ১০ কিমি দূরে সাতপুরার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ 'ধুপগড়'-এর পথে। সেখানে সারাটা দিন ধরে সবচেয়ে বেশি ধুপ অর্থাৎ রোদ থাকে বলে এমন নাম। 'ধুপগড়'-এর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত অপরূপ। এই অঞ্চল সাতপুরা অরণ্যের কোর এলাকায় হওয়ায় যেকোনও সময় শ্বাপদদের মোলাকাতের আশঙ্কা। বিপদ এড়াতে তাই এ পথে হাঁটা মানা। কিছুটা উঠে 'বড় দৃশ' অর্থাৎ 'সুন্দর ভিউ পয়েন্টে' খানিক থামা। এখান থেকে প্রাণভরে দেখে নেওয়া যায় সাতপুরা অরণ্যের মায়াময় রূপ। ১৯৯৯ সালে মধ্যপ্রদেশের বেতুল, হোসাঙ্গাবাদ ও ছিন্দেওয়ারা জেলা নিয়ে গঠিত দেশের অন্যতম বৃহৎ এই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভে আছে তেরোশো প্রজাতির গাছ ও পঞ্চাশ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, তিরিশ প্রজাতির সরীসৃপ, পঞ্চাশ প্রজাতির প্রজাপতি ও আড়াইশোর বেশি প্রজাতির পাখি।

গাড়ির তীব্র চড়াই ভাঙার তালে তাল মিলিয়ে একের পর এক প্রকট হচ্ছে নানান গঠনের বেলেপাথরের পাহাড়। তারই ফাঁকে 'ইকো পয়েন্টে' নিজেদের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শোনার জন্য খানিক হাকাহাঁকি।

গাড়ি সটান উঠে এসে থামল সমতলে, আকাশছোঁয়া একরাশ পাথুরে পাহাড়ের দোরগোড়ায়। দিন ফুরিয়ে আসছে, ছায়া দীর্ঘ হচ্ছে পাহাড়তলিতে। অদ্ভুত এক কমলা আলোয় উদ্ভাসিত চারদিক। গুটি গুটি পায়ে এলাম পুবের সানরাইজ পয়েন্টে। এখান থেকে সূর্যোদয়ের দৃশ্য হয়তো অতুলনীয়, কিন্তু কোনও সাধারণ পর্যটকের তা দেখার উপায় নেই। কারণ 'ধুপগড়ে' ঢোকার চেকপোস্ট খোলেই সকাল ন'টায়। নিঃসীম পাহাড়ঘেরা রোমান্টিক নির্জনতায় দাঁড়িয়ে রেলিংঘেরা পাহাড়ের কিনারা থেকে নীচের দৃশ্য অসাধারণ! মাইলের পর মাইল সাতপুরা অরণ্যের ঘন সবুজ বিস্তার। মাঝে মাঝে আঁকাবাঁকা সর্পিল পথ চলে গিয়েছে কোন অজানায়। দূরে পাঁচমারি শহরের আবছা শিল্যুট। পাহাড়, জঙ্গল, অধিত্যকা, উপত্যকায় ঘেরা মধ্যপ্রদেশের এ এক সুবিশাল প্যানোরামা! ওদিকে সূর্য পাটে নেমেছে। তার রঙিন তুলির টানে আকাশে মায়াজাল। ত্রস্তপায়ে এগলাম পশ্চিমে 'সানসেট পয়েন্টে'র দিকে। পথের বাঁদিকে ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশের তৈরি প্রাচীন এক কলোনিয়াল বাংলো। এখন মিউজিয়াম হয়েছে।

অস্তাচলের রবি রঙের নেশায় ঢুলুঢুলু। ছায়া দীর্ঘ হচ্ছে ভূমিতলে। ক্রমশ দিনান্তের শেষ আলোটুকু মুছে গেল আকাশ থেকে। গোধূলির আকুল ডাকে সন্ধে নামল চরাচর ছেয়ে। তারায় তারায় ভরে গেল আকাশ। ফেরারি বাতাসে বাজল বিদায়ের সুর। নিস্তব্ধ আঁধারে জোনাকিরা জানাল আবার ফিরে আসার আমন্ত্রণ।

ছবি: লেখক

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ, উনিশ শতকের দুই কবি ও কল্লোলিনী তিলোত্তমার কাহিনি। ডিহি কলকাতা থেকে আলোকিত মহানগর হওয়ার গল্প। দুই কবির দুশো বছরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ এই ঐতিহাসিক আখ্যান।

টিমোথি ও আখতার গোঁসাই

শেষ পর্ব

৮২

দেবতোষ দাশ

আগে যা ঘটেছে...

আকাশের নীচে মধুসূদন তীব্র গরমে বিনা চিকিৎসায় বসে আছেন উত্তরপাড়ায়, সন্ধ্যায় গঙ্গার হাওয়া এসে জুড়িয়ে দেয় ক্লান্তি, কবি দিন গোনেন সাদা আলোর এক পৃথিবীর। সেই আলোয় কিছুই দেখা যায় না, ঝলসে যায় চোখ। কবি ইদানীং ঘনঘন দেখতে পান সেই আলো।

‘বাবু, আম্নাকে এই অবস্থায় দেখব, কখনও ভাবিনি— আংরেজি জামা— পাতলুন পরা আমাদের সাহেবের এ কী অবস্থা আল্লা!’

হাসপাতালে মাইকেলের শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলেন মানুষটি। শরীর শীর্ণ ও দুর্বল হলেও মধুসূদনের মুখের হাসি এখনও কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। হেসে পাশে দাঁড়ানো মনোমোহন ঘোষকে বললেন,

‘ওকে চিনতে পারছিস মনু?’

‘চেনা চেনা লাগছে কিন্তু—’

‘আরে মনিরুদ্দিনকে ভুলে গেলি! হাইকোর্টে প্রথম কিছুদিন আমার মুন্সি ছিল!’

‘ইয়েস! মনিরুদ্দিন! তাই বলি, চেনা লাগছে কেন!’ মনে করতে পারেন মনোমোহন।

‘আমার খবর পেলে কোথায় মনিরুদ্দিন?’

‘আম্নি অসুস্থ আর আমি খবর পাবুনি বাবু!’

মনিরুদ্দিনের কান্না থামে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেই থাকেন। তাঁর পিঠে হাত দেন মনোমোহন। এতে তাঁর কান্নার দমক আরও কিছুটা বাড়ে। মনিরুদ্দিনের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে আরও একজন।

‘আরে কালাচাঁদ, তুমিও এসে পড়েছ ভাই!’

মনোমোহন খেয়াল করেন দু’জন মানুষের উপস্থিতি উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে এনেছে মধুসূদনের মুখমণ্ডলে।

‘একে চিনিতে পারিস মনু!’

কালাচাঁদের আগাপাছতলা ভালো করে নিরীক্ষণ করে নেতিবাচক মাথা নাড়ান মনোমোহন।

‘তুই-ই এই মক্কেলকে একদিন আমার কাছে পাঠিয়েছিলি— রোজ ব্রাউন কেসে পুলিসকে আইনি চিঠি দেওয়ার জন্য— মনে পড়ে?’

‘আজ্ঞে স্যার, আম্নার মুন্সি

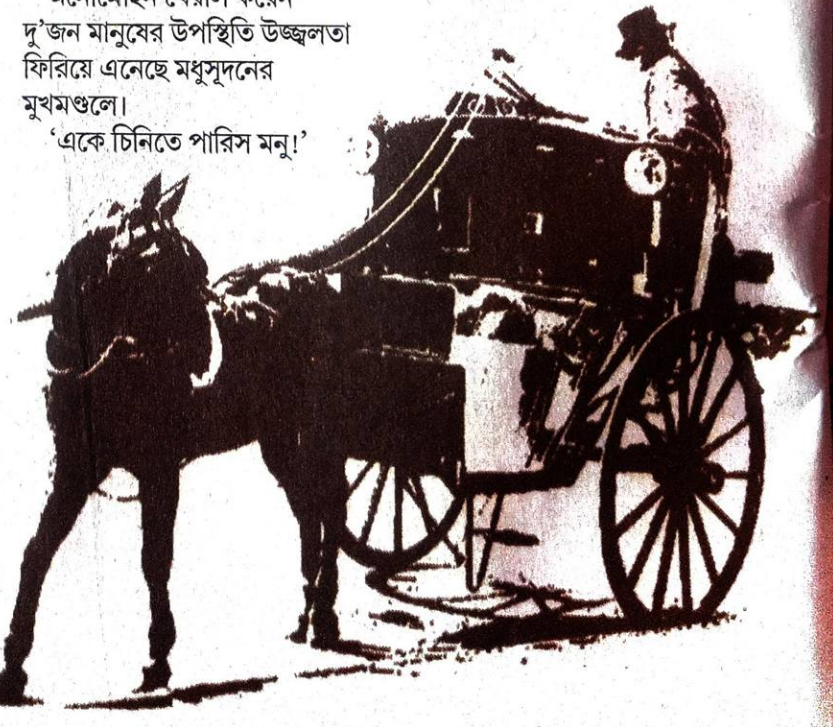

ইসমাইলের সঙ্গে গিয়েছিলুম— ইসমাইল আর আমি এক গাঁয়ের লোক—' হাতজোড় করে মনোমোহনের দিকে তাকিয়ে বলে কালাচাঁদ।

মাথা নাড়েন মনোমোহন। মধুসূদন উঠে বসতে চেষ্টা করেন। তাঁকে নিরস্ত করে ফের শুইয়ে দেন। যকৃৎ, প্লীহার আর গলার অসুখে বহুদিন আগেই ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে শরীর, এখন যকৃতের সিরোসিস ও উদরী রোগ ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর দিকে। ডাক্তার বলেছেন হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যাও আছে। আলিপুরের প্রেসিডেন্সি হাসপাতাল সাদা চামড়ার সাহেবসুবোদের চিকিৎসার জন্য সংরক্ষিত। দেশি কেলেকুলোদের ঠাঁই নেই ওখানে। বন্ধু ডাক্তার সূর্য গুডিভ চক্রবর্তী ও স্বয়ং অধ্যক্ষ ডাক্তার পামারের বদান্যতায় মাইকেলের জন্য একটি শয্যা নির্ধারিত হয়েছে। মনোমোহন নিজেও কলকাতার অন্যতম গণ্যমান্য ও ব্যারিস্টার, এখানে ভর্তির পিছনে তাঁরও কিছু হাতযশ আছে। কিন্তু লাভ কী এই প্রচেষ্টায়, এখন শুধু শেষের সে দিনের অপেক্ষা। জবাব দিয়ে দিয়েছেন ডাক্তার।

'মনু, কালাচাঁদ পুরনো জিনিস কেনা-বেচার ব্যবসা করে— এমনকী ইন্সপেক্টর রিচার্ড রিডের হয়ে খোঁচড়বৃত্তিও করে— এহেন কালাচাঁদ আমায় মেঘনাদবধের কিছু অংশ শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল!' হেসে বলেন মধুসূদন। 'একবার বলবে নাকি কালাচাঁদ? বল একবার লক্ষ্মীটি— শেষবারের মতো মেঘনাদবধ তোমার মুখেই শুনি!'

হাসতেও শক্তি প্রয়োজন, দুর্বল শরীরে তার জোগান কোথায়! তবুও হাসেন মধুসূদন, সর্বশক্তি প্রয়োগ করেই হাসেন। হাসতে হাসতে কথা বলার সময় কাশি ওঠে, মনোমোহন মাথায় ও পিঠে হাত দিয়ে সামান্য তুলে ধরেন, কাশির আস্ফালন প্রতিহত করতে কিঞ্চিৎ সুবিধা হয়। তার মধ্যেই আকারে-ইঙ্গিতে হাত তুলে মধুসূদন বলতে চেষ্টা করেন, বল কালাচাঁদ বল। ইঙ্গিত অনুবাদ করলে অর্থ তাই দাঁড়ায়। তবে যতই কাশি হোক, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আসুক, বলতে তাঁকে হবেই, তাঁর মুখ বন্ধ রাখবে কে? কাশির দমক কমলে মৃদু হেসে বলেন, 'তবে এবার কিন্তু ভাই ঊর্মিলাবিনাশী বোলো না!'

বাক্য সরে না কালাচাঁদের মুখে, হাঁ করে চেয়ে থাকে সে। মরণের কিনারে দাঁড়িয়েও একজন মানুষ রগড় করে যেতে পারেন কীভাবে, একে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত! হাসতে পারছেন না ভালো করে, এমনভাবে কাশছেন, জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে এই বুঝি বেরিয়ে গেল প্রাণটা! ফের কাশি উঠল, কমেও গেল, হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'বল, বল কালাচাঁদ বল!' কাশি কমে না, ফের ফিরে আসে। কালাচাঁদের মুখে রা নেই। মনিরুদ্দিনের চোখ দিয়ে ঝরেই চলেছে জল। এ কাশি কালান্তক, কাশতে কাশতে একসময় রক্ত উঠে আসে মুখে। যেন রক্ত না ওঠা ইস্তক থামবে না দমক! কাপড় দিয়ে যত্ন করে মুখ মুছিয়ে দেন মনোমোহন। কাশি কমে গেলে বিছানায় নেতিয়ে পড়েন মধুসূদন। কিছুক্ষণ পর, খানিক বিশ্রাম নিয়ে, শক্তি সঞ্চয় করে, ইশারায় কাছে ডাকেন তাঁর আদরের মনুকে।

'এক কাজ করবি মনু, পাঁচটা করে টাকা দিবি ওদের— লক্ষ্মী ভাই আমার—' প্রায় ফিসফিসিয়ে বলেন।

মনোমোহন পকেট থেকে টাকা বের করে তুলে দিতে চান কালাচাঁদ আর মনিরুদ্দিনের হাতে। তাঁরা দু'হাত প্রসারিত করে 'না-না' বলে ওঠেন। মধুসূদন শুয়ে শুয়েই হাতের ইঙ্গিতে নিতে বলেন।

'তোমরা নিলে মধুদার ভালো লাগবে— নাও।' মনোমোহন বলেন।

ইচ্ছে না থাকলেও বাধ্য হয়ে, তাঁদের প্রিয় মানুষটিকে খুশি করার জন্য হাত পাতেন তাঁরা। কাঁদতে কাঁদতেই টাকা নেন মনিরুদ্দিন, তারপর কবির পায়ে হাত ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকিয়ে, হাতজোড় করে সামনে যান কবির। হেসে চোখের ইশারায় বিদায় দেন কবি। চলে যান মনিরুদ্দিন। কালাচাঁদও প্রণাম করে।

আপনারা যেখানে খুশি আমাকে সমাধিস্থ করতে পারেন— আপনাদের দরজার সামনে বা কোনও গাছতলায়, যেখানে খুশি— আমার কঙ্কালের শান্তিভঙ্গ না করলেই হল— একদিন আমার কবরের ওপরে গজিয়ে উঠবে সবুজ ঘাস।

তাঁর চোখে জল নেই, মুখে বাক্য নেই, মুখমণ্ডল জুড়ে বিষাদজনিত স্তব্ধতা। ধীর পায়ে বিদায় নেয় সে-ও।

মনোমোহন বিছানায় বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন মধুসূদনের। ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দেওয়ার পর, গতকাল ঘুরে গিয়েছেন দুই যাজক। মধুসূদনের দীর্ঘদিনের পরিচিত প্রবীণ রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও লন্ডন মিশনারি সোসাইটির চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। খ্রিস্টধর্ম অনুযায়ী শেষ স্বীকারোক্তি আদায় করতে এসেছিলেন তাঁরা। সরে গিয়েছিলেন মনোমোহন। মধুদা কী কনফেশন দিয়েছিলেন বা আদৌ দিয়েছিলেন কি না কে জানে, পরে তিনি কিছু জিজ্ঞেস করেননি! করবেনই বা কাকে! কথাপুরুষ মধুসূদন দত্ত এখন কথা বলেন কষ্ট করে, মনোমোহন আর কষ্ট দিতে চান না তাঁর মধুদাকে। বেশ কিছুক্ষণ বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন দুই যাজক। কিছুক্ষণ পর মনোমোহন ফের এসেছিলেন শয্যার পাশে। এসে শোনেন, কৃষ্ণমোহন ও চন্দ্রনাথ আশঙ্কা প্রকাশ করছেন মধুদার অন্ত্যেষ্টি নিয়ে। তাঁকে কোথায় ও কীভাবে সমাধিস্থ করা হবে, তাই নিয়ে বিস্তর গোলযোগের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে চার্চে। শুনে অবাক হলেন মনোমোহন। বছর তিরিশ আগে মধুদার ধর্ম পরিবর্তন নিয়ে বিস্তর প্রচার ও হইহল্লা করেছিল খ্রিস্টান সমাজ। অথচ তাঁর কবরের জন্য দু'গজ জমি তারা ছাড়তে চাইছে না! যাজকদ্বয়ের কথা শুনে মধুসূদনের মুখমণ্ডলে, যথারীতি, স্মিত হাসি। মনোমোহন ভেবেছিলেন কোনও জবাব দেবেন না তিনি, কিন্তু মুখ খুললেন মধুসূদন।

'আপনারা যেখানে খুশি আমাকে সমাধিস্থ করতে পারেন— আপনাদের দরজার সামনে বা কোনও গাছতলায়, যেখানে খুশি— আমার কঙ্কালের শান্তিভঙ্গ না করলেই হল— একদিন আমার কবরের ওপরে গজিয়ে উঠবে সবুজ ঘাস। আমি আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে যাচ্ছি। তিনি আমাকে তাঁর নিজের কাছে লুকিয়ে রাখবেন। মানুষের তৈরি চার্চের ধার আমি ধারি নে!'

মনোমোহন জানেন মধুদার কাছে ধর্ম নিতান্তই একটি গৌণ বিষয়। তাঁর বন্ধু ইন্দ্র মানে সত্যেন্দ্রনাথ একবার মধুদাকে সমাজের জন্য ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করতে বলেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মধুসূদন। ধর্মীয়

সঙ্গীত তিনি লিখতে পারবেন না। খ্রিস্টান হয়েছিলেন বটে কিন্তু ধর্মাচরণের জন্য চার্চে দ্বিতীয় কোনওদিন আর যাননি।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন মনোমোহন, মধুদার মুখে এক পরম প্রশান্তি। মুখমণ্ডল থেকে ক্রমশ দূর হয়ে যাচ্ছে আধি-ব্যাধিজনিত সংঘর্ষচিহ্ন। দুই যাজক চলে যাওয়ার পর গতকাল বিড়বিড় করে বলছিলেন, 'মৃত্যুর রং কি সাদা মনু? আকাশ-সমুদ্র-সিগাল, স-ব সাদা-শ্বেতশুভ্র— এক সাদা পৃথিবীর দিকে চলে যাচ্ছি মনু—'

তারপর আরও কিছু বললেন, পরিষ্কার কানে আসে না মনোমোহনের। শোনার জন্য মাথা নামালেন তিনি। মধুসূদন বলছেন, 'শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে / ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী। / প্রতিঘরে বাঁধা লক্ষ্মী থাকি এইখানে / নিত্য-অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি। / অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে।'

গতকাল বলেছেন, একটু আগে মনিরুদ্দিন আর কালাচাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এখন আর কিছুই বলছেন না মধুদা। মস্ত শঙ্খচিল কি এসে পড়েছে? তাঁকে ডানায় করে নিয়ে যাবে শ্বেতশুভ্র কোনও দেশে!

কালাচাঁদ এখনও যায়নি, ঘুরঘুর করছে আশপাশে। ইঙ্গিতে তাকে ডাকেন মনোমোহন। কালাচাঁদ এগিয়ে এলে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে কিছু বলেন। মাথা নাড়ে কালাচাঁদ।

'বলবে একটিবার যেন এসে দেখে যায়! চিনতে পারবে আশা করি?'

'আজ্ঞে বিলক্ষণ! ও বাড়ির সকলকে চিনি স্যর!'

বেরিয়ে যায় কালাচাঁদ। তার গমন দ্রুত। নীচে নেমে সে এগিয়ে যায় বাগানের দিকে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কারওকে খোঁজে। পুকুরপাড়ে নারকেল গাছের তলায় পেয়ে যায় তার উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে। দীর্ঘকায় সুদর্শন সেই যুবা জনারণ্যে হারিয়ে যাওয়ার মতো নয়। এগিয়ে যায় কালাচাঁদ। নিকটে গিয়ে, নিচু গলায়, মনোমোহন ঘোষ যা বলতে বলেছিলেন বলে। শুনে দু'দিকে সবেগে মাথা নেড়ে হনহন করে মূল ফটকের দিকে এগিয়ে যান সেই যুবক।

অস্থির, অবিন্যস্ত সেই যুবকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বিহ্বল কালাচাঁদ। ততক্ষণে হাসপাতালের গেট পেরিয়ে গিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। বিহ্বলতা কাটিয়ে কালাচাঁদও বেরিয়ে যায় হাসপাতাল ছেড়ে। মেটিয়াবুরুজের দিকে এগয় সে, নবাবকে খবর দেওয়া দরকার।

হনহন করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। চোখ রক্তবর্ণ। ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ। যেন অনিবার্য কোনও ঘটনা রুদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। নাহ্, তিনি মধুসূদন দত্তের এই চেহারা দেখতে যেতে পারবেন না! যাবেন না বলেই, মনুদার কথা অগ্রাহ্য করে নীচে পুকুরপাড়ে বসে ছিলেন এতক্ষণ। মনুদা ওয়ার্ড থেকে খবর পাঠিয়েছেন, মধুদাকে একটিবার শেষ দেখা দেখে যাও নতুন! নাহ্, আমি পারব না মনুদা! আগুনখেকো প্রমিথিউজ রক্তবমি করছেন, মৃত্যুর পালোয়ানি প্যাঁচ তাঁকে পেড়ে ফেলেছে, তিনি দেখতে পারবেন না! মনুদা যতই বলুন, মৃত্যুশয্যায় তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দেখতে পারবেন না! প্রমিথিউজরা মরেন না! মাইকেলের মৃত্যু নেই! কিন্তু এগুলো তো কথার কথা, সারসত্য হল, শহর ছাড়িয়ে আলিপুরের প্রেসিডেন্সি হাসপাতালে মধুসূদন দত্ত মৃত্যুকে জড়িয়ে ধরে মুখচুম্বন করছেন, যেমনটি উনি করে থাকেন প্রিয়জনের সঙ্গে! সেই দৃশ্য থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে দূরে চলে যাচ্ছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তিনি কি পালাচ্ছেন? পালাচ্ছেন সেই কৃষ্ণকায়, ইংরেজি ফ্যাশনে ছাঁটা কোঁকড়া চুল, মাঝখানে সিঁথি লোকটির থেকে, যিনি তাঁদের বাড়িতে বড় জামাইবাবুর কাছে আসতেন মেঘনাদবধের পাণ্ডুলিপি নিয়ে। তিনি কি পালাচ্ছেন বড় বড় চোখ, লোচন প্রতিভা-দীপ্ত, দোহারা চেহারার, অপূর্ব লাবণ্য-সমুজ্জ্বল মুখশ্রীর মধুসূদন দত্তের থেকে যিনি ভাঙা গলায় তাঁদের নীচের ঘরে কেটে-কেটে বলে যেতেন, 'সম্মুখ-সমরে-পড়ি-বীর-চূড়া-মণি-বীর-বাহু-চলি-যবে-গেলা-যম-পুরে-অকালে-!'

হনহন করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। চোখ রক্তবর্ণ। ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ। যেন অনিবার্য কোনও ঘটনা রুদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। নাহ্, তিনি মধুসূদন দত্তের এই চেহারা দেখতে যেতে পারবেন না!

কিন্তু কোথায় পালাবেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ?

তাঁকে স্তম্ভিত করে সহসা দৈববাণী আকাশ-বাতাস জুড়ে— 'আমি সেই আগুনচোর প্রমিথিউস— বাংলা সাহিত্যে চুরি যাওয়া আগুন আবার ফিরিয়ে এনেছি! জ্যোতি, সেই আগুন রক্ষা করতে হবে!'

স্তব্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চোখ বোজেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিনি ফের স্পষ্ট শুনতে পান— 'তুমি পারবে না? পারবে না জ্যোতি?'

[এই উপন্যাস লিখতে যাঁদের গ্রন্থ, প্রবন্ধ, গবেষণা, ভাবনা ও উদ্যোগ সহায়ক হয়েছে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ বসু, নগেন্দ্রনাথ সোম, মোহিতলাল মজুমদার, প্রমথনাথ বিশী, সুরেশচন্দ্র মৈত্র, গোলাম মুরশিদ, ক্ষেত্র গুপ্ত, মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, তাপস ভৌমিক, আবদুল হলীম 'শরর', অনিল তপাদার, শ্রীপান্থ, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, রোজি লিওয়েলিন জোন্স, সুদীপ্ত মিত্র, অমরেশ মিশ্র, মির্জা মহম্মদ রুশোয়া, সুনীলকুমার সেন, শামিম আহমেদ, জগদীশ ভট্টাচার্য, চিত্রা দেব, ইন্দিরা দেবী, শিবনাথ শাস্ত্রী, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, মন্মথনাথ ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, অরুণ নাগ, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, বিনয় ঘোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর মল্লিক, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য, ইফতিকার-উল-আওয়াল, রিচার্ড রিড, পরিমল গোস্বামী, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার দাশ, অরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রাণতোষ ঘটক, শান্তা শ্রীমানী, অশোককুমার রায়, ঝরা বসু, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মৃতিকুমার সরকার, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপদ ভৌমিক, নিখিল সুর, মুনতাসির মামুন, ফেরদৌসী খাতুন, সঞ্চারী দাশগুপ্ত, টমাস এ টিমবার্গ, রেবা মুহুরী, কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অতনু চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, অদ্রীশ বিশ্বাস, দর্শন চৌধুরী, দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়, একরাম আলি, সমিপর্ণা সামন্ত, বিশ্বজিৎ রায়, শর্মিষ্ঠা দে, হরিলাল নাথ, অরুণকুমার সাঁফুই, সুধাংশু মুখোপাধ্যায়, সমীর সেনগুপ্ত, খসরু পারভেজ, শুভেন্দু সরকার, স্মৃতিকণা চক্রবর্তী, সৌগত মুখোপাধ্যায়, মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়, শিশির সমতটী, দেবব্রত মল্লিক, জয়ন্ত দে, কামরান মির্জা, মনজিলাত ফতেমা, শুভাশিস বক্সী।]

(সমাপ্ত)

সুখে থাকুন

এ সপ্তাহে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশিষ্ট জ্যোতিষী **সুনীতি বন্দ্যোপাধ্যায়**

• আমার কাকার জন্মবৃত্তান্ত পাঠালাম। কয়েক বছর ধরে বয়সজনিত সমস্যায় ভুগছেন। আর কতদিন ভুগবেন? খুব কষ্ট পাচ্ছেন।

পরিমল মুখার্জি
কামালগাজি, কলকাতা-৭০০১০৩

•• জাতকের কন্যা লগ্ন, তুলা রাশি, স্বাতী নক্ষত্র, কৃষ্ণ পক্ষ, সপ্তমী তিথি, শূদ্র বর্ণ, দেব গণ।
বিংশোত্তরীয় রাহুর দশায় জন্ম। বর্তমানে শুক্রের দশা চলছে। এই শুক্র সপ্তমে তুঙ্গস্থ হয়ে অবস্থান করছে। জাতকের চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি পাপ গ্রহ। শুক্র শুভ গ্রহ। মঙ্গল মারক। বর্তমান সময়ে ঠান্ডা লাগা, সর্দি, শ্লেষ্মা, চোখের রোগে ভুগতে হবে। এটা দেখে ভালো লাগল বর্তমানে যেখানে সন্তানরা পিতার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেন না, সেখানে আপনি আপনার কাকার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি মহামৃত্যুঞ্জয় হোমযজ্ঞ করলে আপনার কাকার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

•••

• জন্মবৃত্তান্ত পাঠালাম। শিক্ষা, চাকরি, বিবাহিত জীবন এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানতে চাই। সর্বোপরি কেমন মনের মানুষ হবে।

অনিলমোহন দে
শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগনা

•• জাতকের মিথুন লগ্ন, সিংহ রাশি, মঘা নক্ষত্র, ক্ষত্রিয় বর্ণ, দেবারি গণ, বিংশোত্তরীয় কেতুর দশায় জন্ম। কৃষ্ণ পক্ষ নবমী তিথি।

জাতকের লগ্নাধিপতি বুধ। মঙ্গল শুভ। বৃহস্পতি ও রবি অশুভ গ্রহ। শুক্র শুভ ফলদাতা। বৃহস্পতি ও শনির সম্বন্ধ রাজযোগকারক নয়।

জাতক ধীর স্থির ও শান্ত। বালক স্বভাবের। মস্তিষ্কের রোগ, চোখের সমস্যা, মাথা যন্ত্রণা, হৃদরোগ ও গলার সমস্যায় ভুগতে হতে পারে। জিভের ক্ষত, কানে কম শোনার সমস্যা থাকবে। জাতকের হৃদয় উদার ও পর দুঃখে কাতর। সৎ, সহজ, সরল কিন্তু বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। কথাবার্তা শাণিত। ভদ্রতাবোধ প্রশংসনীয়। অসত্য ভাষণ, অন্যায় কাজ ও কুটিলতা মোটেই পছন্দ করেন না। হঠাৎ রেগে যাওয়ার প্রবণতা আছে। বিবাহিত জীবনে কিছু সুখের অভাব থাকবে। নিজের দাম্পত্য অশান্তির মূলে জাতক নিজের সন্দেহ বাতিক স্বভাব ত্যাগ করতে পারলে দাম্পত্য শান্তি বজায় থাকবে। সংসারে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি দাম্পত্য শান্তির হানি করবে। আবেগ সংযত রাখতে হবে। জ্ঞাতি আত্মীয়রা সুবিধার নয়।

•••

• কন্যার জন্মছক পাঠালাম। মেয়ের বিয়ে নিয়ে বড়ই উদ্বিগ্নে আছি। বিবাহ কবে হবে? বিবাহিত জীবন কেমন কাটবে?

অমিতকুমার ঘোষ
সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

•• জাতিকার মিথুন লগ্ন, বৃশ্চিক লগ্ন, অনুরাধা নক্ষত্র, কৃষ্ণ পক্ষ, অষ্টমী তিথি। বিপ্র বর্ণ, দেব গণ, বিংশোত্তরীয় শনির দশায় জন্ম। বর্তমানে শুক্রের দশা চলছে।

জাতিকার মঙ্গল শুভ। বৃহস্পতি ও রবি অশুভ গ্রহ। শুক্র শুভ। জাতিকার নবাংশ ছক অর্থাৎ বিবাহকারক ছকে মাঙ্গলিক। বর্তমানে শুভ বিবাহের যোগ চলছে। বিবাহিত জীবনে তেমন কোনও সমস্যা নেই। বিচ্ছেদের যোগ দেখা যায় না। বিবাহিত জীবনে তেমন কোনও অশান্তির যোগও নেই। একটা ক্যাটস আই ধারণে শুভ ফল পাবেন। মুক্তো ধারণ করবেন না। এতে হিতে বিপরীত হবে।

•••

• জন্মবৃত্তান্ত পাঠালাম। গৃহের সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন। প্রতিকার থাকলে জানান।

জ্যোতিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
ঠিকানা অনুল্লেখিত

•• জাতকের তুলা লগ্ন, বৃষ রাশি, রোহিণী নক্ষত্র, নর গণ, বৈশ্য বর্ণ, বিংশোত্তরীয় চন্দ্রের দশায় জন্ম। বর্তমানে শনির দশা চলছে।

আপনার লগ্নাধিপতি শুক্র। বৃহস্পতি, রবি ও মঙ্গল পাপগ্রহ যুক্ত। যার ফলে গৃহে সবসময় কথা কাটাকাটি বাগ-বিতণ্ডা লেগেই থাকবে। চন্দ্র ভঙ্গ কালসর্প যোগ দেখা যায়। আপনি একটা ভালো মুক্তো পরিধান করুন। অন্য কোনও রত্ন ধারণ করবেন না। বগলামুখী হোমযজ্ঞে শুভ ফলের আশা করতে পারেন।

যোগাযোগ: ৭৪৩৯২০৮২৩১/ ৯৪৩৩৬০৬০২৪

• **এই বিভাগে পাঠানো চিঠিতে জন্মছক (যদি থাকে), জন্মসময়, জন্মতারিখ, জন্মস্থান ও ফোন নম্বর অবশ্যই পাঠাবেন।**

এক বিপন্ন জার্নালের ইতিকথা

রূপক মিশ্র

ভণিতাহীন, বিপজ্জনক, স্নায়বিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই তিনটি বিশেষণে চিহ্নিত করা যেতে পারে। অসংখ্য কিংবদন্তি, অপরীক্ষিত মিথ মাথায় নিয়ে পড়তে বসে, পাঠশেষে প্রচুর ভ্রান্তিনিরসন, কিছু ধারণার পুনর্গঠন এবং অমীমাংসিত ধোঁয়াশা মিলেমিশে লেখক ও মানুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে পাঠক দাঁড়াবেন। তখন তাঁকে সর্বার্থে উপকথার নায়ক বলে মনে করা যেতেই পারে।

তিনি যতটা প্রতিভাসম্ভূত ততটা পরিশ্রমী নন—এই আনুপাতিক ভাগাহারের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব ডায়েরি পাতা ওল্টানো মাত্র নস্যাৎ হয়ে যায়। জবাব মেলে তাঁর আপাত নৈর্ব্যক্তিকতার যাথার্থতা নিয়েও। অন্যদিকে শেষজীবনে অতিলৌকিক শক্তির কাছে বিক্ষত নায়কের মতো আত্মসমর্পণের আগ্রহ সংক্রান্ত রহস্য রহস্য-ই রয়ে যায়।

১৯২৮ সালে সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ। ১৯৫৬ সালে চিরপ্রস্থান। হিসেবমতো আঠাশ বছরের লেখক জীবন। সেখানে শেষ এগারো বছর (১৯৪৫-১৯৫৬) ডায়েরি লিখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাকুল্যে বারো খানা ডায়েরি বইতে ধৃত তাঁর জীবনের অন্ত্যপর্ব। কবি, প্রাবন্ধিক যুগান্তর চক্রবর্তীর অতুলনীয় সম্পাদনায় গ্রহণ-বর্জনের পর তা প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। ২০১১ সালে এসে আমরা পাই 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়েরি ও চিঠিপত্রে'-র পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ। সংক্ষেপে হলেও ভূমিকা-প্রবন্ধে সম্পাদক জানান ডায়েরি সংগ্রহের নেপথ্য কথা। রংচটা, তোবড়ানো, মরচে-মলিন একাধিক টিনের তোরঙ্গ থেকে দিনলিপি উদ্ধারের পর যুগান্তরবাবুর কাছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অতি নিকটজনে'-র 'সন্তপ্ত স্বীকারোক্তি' ছিল—এরকম অনেক কাগজই তাঁরা ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিয়েছেন। বাতিল জঞ্জাল ভেবে তা দিয়ে ধরানো হয়েছে উনুন। এপর্যন্ত পড়ে মন শোকে, বিস্ময়ে দ্রব হওয়ার পরমুহূর্তে আমাদের স্মরণে আসতে বাধ্য—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও পাণ্ডুলিপিই আজ সম্পূর্ণ অবশিষ্ট নেই! যদি থাকত, তাহলে 'দিবারাত্রির কাব্যে'-র দু'টি ভিন্ন পাঠ, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-র সমাপ্তি সংক্রান্ত একাধিক পরীক্ষা সমেত 'পরিশ্রমী লেখক' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি জরুরি পরিচয় হয়তো নির্মিত হতো। পরিতাপের বিষয় এই, যে লেখক জীবনের আদিপর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও ডায়েরি লেখেননি। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' লেখার সময় তিনি প্রথম মৃগীরোগে আক্রান্ত হন। অথচ সেকথা অনেক পরে লেখা চিঠিতে (১৯৫৫) তিনি স্বীকার করেছেন। আঠাশ বছরের এক প্রতিভাবান তরুণ বাড়ির অমতে বিজ্ঞানশাস্ত্র ছেড়ে পুরোপুরি সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত হওয়ার পর আচমকা চিকিৎসাতীত ব্যাধির কবলে পড়ে কোন দুঃস্বপ্ন, কোন অন্ধকার সময়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। 'দিবারাত্রির কাব্যে' হেরম্বের নিজের স্ত্রীকে কড়িকাঠের সঙ্গে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়ার স্মৃতি, তার নিঃসীম একাকিত্ব, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-য় চিকিৎসক শশীর জীবনের সামগ্রিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সবকিছু খুইয়ে ফেলার যন্ত্রণা পাঠকের হাতে পরোক্ষ আত্মজৈবনিক কিছু সূত্র তুলে দেয় মাত্র।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুপরিকল্পিত

সাহিত্যিক ডায়েরি লেখেননি। এক অর্থে এ আমাদের বড় প্রাপ্তি। বিভূতিভূষণের 'উর্মিমুখর', 'উৎকর্ণ'-এর সঙ্গে মানিকের ডায়েরির মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। দরবারি প্রকাশ নয়, নিরাভরণ আত্মপ্রকাশই তাঁর দিনলিপির মূল সুর। এই রোজকার লেখা কোনওদিন ছেপে বেরবে—এমন দূরতম কল্পনাও লেখকের মনে ছিল না। তাই অক্লেশে নিজেকে উন্মুক্ত করেছেন তিনি। কখনও গল্পের প্লট, কখনও বাজার খরচের হিসেব রোজনামচার ফাঁকফোঁকরে আত্মগোপন করে থেকেছে। বাক্যও হয়তো সম্পূর্ণ করেননি; নিজের বোঝার সুবিধের জন্য কোথাও বা আদ্যক্ষর দিয়ে ঘটনা ও অনুষঙ্গের ইঙ্গিতমাত্র রেখেছেন। কয়েক ছত্র কবিতা লিখতে বসে হঠাৎই দিনপঞ্জির আঁচড় কেটেছেন। আবার খাস ডায়েরি-বইয়ের পাতায় স্থান করে নিয়েছে এপিলেপ্সি সংক্রান্ত ব্যক্তিগত নোটস, দেশি-বিদেশি চিকিৎসাবিধি, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের উক্তি, দার্শনিক বচন এমনকী ঘোড়দৌড় সংক্রান্ত সাংকেতিক অঙ্ক! নিরবচ্ছিন্ন নয় এই দিনলিপি। বরং, শুরুতে ক্বচিৎই তিনি এন্ট্রি রেখেছেন। ধারাবাহিক হতে না পারা নিয়ে অনুতাপ করেছেন। ১৯৫৫ সালের কোনও রোজনামচা হয়তো ১৯৪৬ সালের ডায়েরিতে লিখে ফেলেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপি তাই কোনও সাজানো স্তবক নয়। দ্বিধাদীর্ণ এক মানুষের আলেখ্য হয়তো দিনলিপির অবিন্যস্ততার কারণেই আরও জীবন্ত হয়ে আজ আমাদের কাছে ধরা দেয়।

১৯৪৫-এর প্রথম ডায়েরিটিকে এক কথায় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনার আঁতুড়ঘর বলা যেতে পারে। 'ছিনিয়ে খাইনি কেন', 'বেড়া', 'ছাঁটাই রহস্য'-র মতো গল্পের প্লট রূপরেখা আকারে লিখে রাখছেন মানিক। 'Composers of Bengal' শিরোনামে শ্রীধর কথক, গোপাল উড়ে, রূপচাঁদ পক্ষীদের মতো উনিশ শতকের বাঙালি সঙ্গীতকারদের জীবনী সংক্রান্ত নোটসও ঠাঁই পাচ্ছে। ধরন থেকে অনুমেয়, ছোট মাপের গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের জন্য লেখক নিজেকে প্রস্তুত করছেন। এই ডায়েরি পাণ্ডুলিপি নয়। তাই চিন্তা, পরিকল্পনা সবই চূর্ণাকারে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। যেমন— জনপ্রিয় গল্প 'ছিনিয়ে খাইনি কেন'-র প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন—

১৯৪৫-এর প্রথম ডায়েরিটিকে এক কথায় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনার আঁতুড়ঘর। 'ছিনিয়ে খাইনি কেন', 'বেড়া', এর মতো গল্পের প্লট রূপরেখা আকারে লিখে রাখছেন মানিক। 'Composers of Bengal' শিরোনামে শ্রীধর কথক, গোপাল উড়ে, রূপচাঁদ পক্ষীদের মতো উনিশ শতকের বাঙালি সঙ্গীতকারদের জীবনী সংক্রান্ত নোটসও ঠাঁই পাচ্ছে।

'দুর্ভিক্ষপীড়িতেরা লুটে খায়নি কেন?—তারা অহিংস একথা ভুল—না খেয়ে দুর্বল ভোঁতা হয়ে পড়েছিল—যে তেজ লুট করার প্রেরণা দেয় তা ছিল না—' ব্যস! এটুকুই। গল্পের স্পিরিট বিষয়ে লেখক হিসেবে নিজেকে নিঃসংশয় রাখামাত্র।

পরের বছর, ১৯৪৬ সালের ডায়েরি, স্বভাবধর্মে দিনলিপির মেজাজ পেয়েছে। গল্পের প্লটের রেখাচিত্র এখানেও আঁকা হয়েছে। কিন্তু মানুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই প্রথম আমরা খোলামেলা মেজাজে খুঁজে পাচ্ছি। সাংবাদিক সুলভ গদ্যে তিনি ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার গতিশীল ভাষ্য রচনা করছেন। ১৬ আগস্ট সকালবেলার এন্ট্রি এরকম: 'ভোরে উঠে শুনলাম রাত্রে রান্নাঘর থেকে সব কিছু চুরি হয়ে গেছে—গুড়, তেল, তরিতরকারি, কলাইকরা বাটি—সব কিছু। আজ হরতাল—direct action day, দাঙ্গার সংবাদ শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ক্রমাগত গুজব রটছে—চারিদিকে দারুণ উত্তেজনা। কালীঘাট অঞ্চলে শিখদের সঙ্গে মুসলিমদের ভীষণ সংঘর্ষ হয়েছে শুনলাম। ফাঁড়ির ওদিকে নাকি গোল বেঁধেছে। মসজিদের সামনে ভিড় দেখে এলাম। পাড়ার ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে defence party গড়ছে। কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে—ছোঁয়াচ লেগে—নার্ভাস হয়ে পড়লাম। অক্ষয়বাবুর ছেলে হৈচৈ চেঁচামেচি ক'রে—শাঁখ আর হুইস্‌ল বাজাবার ব্যবস্থা ক'রে—পাড়াকে সরগরম করে রেখেছে—১৫/২০ মিঃ অন্তর অকারণে alarm পড়ছে।' ১৬-১৯ আগস্ট মোট চারদিনের বর্ণনায় নির্মোহ গদ্যকার মানিকের ছাপ স্পষ্ট। পাশাপাশি প্রগতিশীল, দায়বদ্ধ ও দরদী লেখকসত্তাও নির্মোক ভেঙে বেরিয়ে আসে—'বিকালে এ অঞ্চলে শান্তি-সভা হবে শুনলাম। খুশী হয়ে নিজে বার হলাম—যতটা পারি সাহায্য করতে। যাকে দেখছি তাকে বলছি—মিটমাটের জন্য সভায় যেতে। ফাঁড়ি পেরিয়ে পুলের নীচে যেতে এল বিরোধিতা—হিন্দুদের কাছ থেকে। কিসের মিটমাট—মুসলমানরা এই করেছে, ওই করেছে! 'ব্যাটা কমিউনিস্ট' বলে আমায় মারে আর কি! প্রায় দেড়শো লোক মিলে ধরেছিল।' এহেন সামাজিক দায়বদ্ধতার সমান্তরালে কন্যার টনসিল অপারেশন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত পিতার মানসিক উচাটনও ডায়েরির পাতায় লেখা থাকে।

ঘরে-বাইরে যখন সংকট তখন শরীরও শোধ তোলে। বছরভোর মৃগীর উপক্রম লেগে থাকে। ডায়েরির পুস্তনিতে 'F 1946' হেডিংয়ে পর পর এপিলেপ্সির আক্রমণের দিনক্ষণ লেখা। ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বর, কখনও খুব ভোরে কখনও দুপুরে প্রায় অজান্তেই, ফিটগ্রস্ত হন। এসবের মধ্যে কাজ থেমে থাকে না। 'প্রত্যহ', 'সীমান্ত', 'গল্পভারতী', 'দীপায়ন', 'সাহিত্যপত্র'-র মতো ছোট-বড় পত্রিকায় মানিক গল্প পাঠাতে থাকেন। না লিখলে হাঁড়ি চড়বে না। 'কলম-পেষা

মজুর' তিনি। তাই ৬ ডিসেম্বর ডায়েরিতে বলেন—'প্রত্যহের রবিবাসরীয়ের জন্য ৩৫ টাকায় গল্প দিতে অক্ষমতা জানালাম। ৫০ টাকা সর্বনিম্ন মজুরি।' আমাদের স্মরণে আসবে আঠারো বছর আগে ১৯৩৮ সালে জনৈক এক সম্পাদককে লেখা চিঠির কথা। যেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্লেষের সুরে বলছেন—'সম্মানমূল্যের জন্য আমি গল্প লিখি না, গল্প লিখিয়া কিছু সম্মানমূল্য প্রত্যাশা করি। আজকাল একটা অপরাধ করিতে আরম্ভ করিয়াছি—গল্পের জন্য কিছু বেশী পারিশ্রমিক দাবী করি। অপরাধ তবু মার্জ্জনীয়, অভদ্রতার মার্জ্জনা নাই। তবু একটা ঘোরতর অভদ্রতা করি—প্রায় দোকানদারের মতোই প্রার্থনা জানাই পারিশ্রমিকটা হাতে হাতে নগদ দিতে হইবে।' যথোপযুক্ত পরিশ্রমের পর হকের মজুরি 'ছিনিয়ে' আনায় লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে কোনওদিন এতটুকু দ্বিধা ছিল না।

১৯৪৮-এর ডায়েরি অনিয়মিত ও সংক্ষিপ্ত। জানুয়ারি, এপ্রিল ও মে মাসের হাতেগোনা কিছু এন্ট্রি। কখনও বোম্বাই কখনও আন্দুল। বিভিন্ন প্রান্তের সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন মানিক। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র ছায়াচিত্রের চুক্তি সই করছেন। সাংসারিক ঝঞ্ঝাট মিটছে না বটে। তবু সৃষ্টিশীল সময় বেশ উপভোগ করছেন। ডায়েরির বচনে তা স্পষ্ট।

ভালো-মন্দ মিলিয়ে পরের বছরটিও (১৯৪৯) কেটে যায়। টালিগঞ্জের দিগম্বরীতলায় পৈতৃক বাড়ি বিক্রির সূত্রে সংসারে ডামাডোল আসে। যে কারণে 'বাড়ী সমস্যা!' লিখে তাঁর একাধিক এন্ট্রির শুরু। একদিকে উদভ্রান্তের মতো ভাড়াবাড়ি খুঁজে চলেছেন। অন্যদিকে ট্রামের ভাড়াবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের প্রতিবাদ ও পুলিসি বর্বরতায় চারজন ছাত্রের মৃত্যুতে উদ্বেল মন। ২০ জানুয়ারির দিনলিপিতে নাশকতা-সন্ত্রস্ত কলকাতার জীবন্ত ছবিটি এরকম—'আজ পুলিশের সাহায্যে মিলিটারী আমদানী। কলেজ স্ট্রিট দিয়ে যেতে শুধু পথে নয়—সিনেট হাউসে প্রেসিডেন্সী কলেজের ভেতরে সৈন্যের ঘাঁটি দেখে মনে হয় অদ্ভুত দৃশ্যই বটে! কলেজের ছাতে বন্দুক তাক করে সৈন্য!' উল্লেখ্য, বেশ কিছু টিপ্পনি ও মন্তব্যের সূত্রে সাংসারিক সীমাবদ্ধতায়

১৯৪৮-এর ডায়েরি অনিয়মিত ও সংক্ষিপ্ত। জানুয়ারি, এপ্রিল ও মে মাসের হাতেগোনা কিছু এন্ট্রি। কখনও বোম্বাই কখনও আন্দুল। বিভিন্ন প্রান্তের সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন মানিক। পুতুলনাচের ইতিকথার ছায়াচিত্রের চুক্তি সই করছেন। সাংসারিক ঝঞ্ঝাট মিটছে না বটে। তবু সৃষ্টিশীল সময় বেশ উপভোগ করছেন। ডায়েরির বাচনে তা স্পষ্ট।

বিক্ষিপ্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রথম আমাদের নজরে আসেন। 'দাদা চিরদিন অকৃতজ্ঞ অর্থপিশাচ', 'বাড়িওয়ালা সম্পর্কে প্রথম ধারণাই পরিপুষ্ট হচ্ছে—আদর্শ আত্মকেন্দ্রিক নিম্নমধ্যবিত্ত বিষয়ী এবং স্ত্রৈণ', 'বিজয়লালের বন্ধু বাংলা কংগ্রেসের চর কালো বেঁটে ধূর্ত্ত ভাবপ্রবণ অবিবাহিত আদর্শবাদী তার্কিক সস্তা কৌশলী'—মন্তব্যগুলি ক্ষুদ্র মানুষী চৌহদ্দিতে ঘুরপাক খেলেও বিশ্লেষণপ্রিয় কথাকারের তির্যক চাহনিকেও কি অস্বীকার করা যায়? শক্তিমান লেখকের দুর্মর অহংও উঁকিঝুঁকি মারে কোথাও কোথাও—'ট্যাক্সিতে গিয়েছিলাম—ট্যাক্সিতে ফিরলাম। কলেজগুলির প্রচুর পয়সা—শিক্ষার ব্যবসা। তবু, ছাত্রদের চাপে আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার বক্তৃতা ছাত্রদের শোনাতে হল—তারাশঙ্করকে নয়!'

১৯৫০ থেকে ডায়েরির চরিত্র বদলাতে থাকে। বরানগরের ভাড়াবাড়িতে ক্যানভাসের পার্টিশন দিয়ে পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের থাকার ব্যবস্থা করা, স্ত্রীর মৃত সন্তান প্রসব, আর্থিক দুর্দশা, 'পরিচয়' পত্রিকায় লেখার অপরাধে প্রগতি লেখক আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ বিরোধ—সব মিলিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে বাধ্য হন 'জীবনটা সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে।' অনটন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যাতে করে তাঁকে লিখতে হয়—'বাচ্চা মরে যাওয়ায় ডলি অখুসী নয়। বলল যে বাঁচা গেছে বাবা, আমি হিসেব করছি বাড়ী ফিরে মাসখানেক বিশ্রাম করে রাঁধুনি বিদায় দেব! অনেক খরচ বাঁচবে।' স্ত্রীর এই অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার কারণ অনুসন্ধানে মানিকের বিশ্লেষণ—'মানুষ সন্তানকে ভয় করছে? দশ মাস গর্ভ ধারণ করে মৃত সন্তান প্রসব করে মা ভাবছে, বাঁচা গেল? অভিশপ্ত সমাজ এমনি অস্বাভাবিক করেছে জীবন।' ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে সাংসারিক ব্যয় সংকোচনের উদ্দেশে 'ত্রৈমাসিক প্ল্যানে'-র ছক কষেন মানিক। সিগারেট ও মদের খরচ কমানো, ঋণ মিটিয়ে অন্তত ৫০০ টাকা সঞ্চয়, স্বাস্থ্যের উন্নতিকে প্রধান কাজ হিসেবে দেগে দেন। সেই সঙ্গে অন্তিম সতর্কবার্তা—'কঠোর চেষ্টার দ্বারা এই তিনমাসে বর্তমান অবস্থা অনেকটা বদলাইয়া না দিলে সর্বনাশ ঠেকানো যাইবে না।' টাল সামলাতে প্রকাশকের দপ্তরে নতুন চুক্তি, পাওনা-বকেয়া উদ্ধার নিয়ে নাজেহাল হয়ে পড়েন। গল্পের প্লটের চিহ্ন ধীরে ধীরে মুছে যায়। জায়গা নেয় রোগজ্বালা, সংসারে স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি, সন্তানদের অসুস্থতার প্রসঙ্গ। সবকিছু সামাল দিতে অর্থের সন্ধানে পদাতিক মানিক হন্যে হয়ে হেঁটে চলেন শহরের এ মাথা থেকে ও মাথা—'সারাদিন ঘুরেছি—দুপুর ১টা থেকে রাত রাত ৮টা। ২ মাইল হাঁটা হয়েছে।... আজও বেরিয়ে অনেক কাজ সেরে এলাম—প্রকাশকদের কাছে—কী শ্রান্তিই বোধ করছি।' (১৯৫৩)

এতকিছুর পরেও হকের মজুরি মেলে কই? 'লাজুকলতার শেষ ফর্মা কভার সই করলাম, টাকা কই?', 'গল্পভারতীর অগ্নিশুদ্ধির প্রুফ দেখে দিলাম— মজুরি পাঠায়নি', 'বেঙ্গলে শচীনের কাছে ১০০ টাকা চেয়ে পত্র দিলাম'—পর পর এন্ট্রিগুলি হতাশায়, বেদনায়, আর্তনাদে আতুর।

হয়তো এরই ফলশ্রুতিতে পরের বছর, ১৯৫৪ সালের ১ জানুয়ারির পাতায় প্রথমবারের জন্য আমরা 'মা'-এর উচ্চারণ শুনি। সরকারি উদ্যোগে ডিভিসি পরিদর্শন বাতিল হওয়ার প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন—'মা বোধহয় ভালই করলেন।' কে এই মা? কোনও সুস্পষ্ট উত্তর লেখক দেননি। মা কালীর অনুমান জনপ্রিয় হলেও সত্য নয়। কারণ ২৮ এপ্রিলের এন্ট্রিতে লেখক স্পষ্ট বলছেন—'কোনো প্রতীক অবলম্বন না করলে প্রণামের সময় বিক্ষিপ্ত হয় কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে প্রতীক প্রতীক—মা কে বা কেমন জানি না।' পরের বছর (১৯৫৫) যখন তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে হাসপাতালে শুয়ে তখনও একই কথার প্রতিধ্বনি—'মায়ের রূপ গুণ কিছুই জানি না, কি নিয়মে দয়া করেন তাও জানি না, শুধু এটুকুই জানি যে মায়ের নিয়মের এদিক ওদিক নেই...'

এ প্রসঙ্গে শুধু এটুকুই বলার, যে শেষ জীবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদী তত্ত্বাদর্শ থেকে সরে গিয়ে দৈবীশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন—এই বহুল প্রচারিত মত আদতে গুজব-বিশেষ। ফ্রয়েড পর্ব, মার্কস পর্ব, আধ্যাত্মিক পর্ব বলে জল-অচল কোনও বিভাজন মানিকের জীবনে ছিল না। প্রথমত, মৃত্যুর আগের বছর (১৯৫৫) হাসপাতালে শুয়ে যখন তিনি ডায়েরিতে মায়ের দয়া, ক্ষমা নিয়ে নিয়ে লিখছেন, তখন একইসঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ নির্বাচনে দলের ভরাডুবি দেখে ব্যাকুল হচ্ছেন। পার্টির সংস্কার ও শোধন বিষয়ে খোলাখুলি সমালোচনা করছেন। স্পষ্ট জানাচ্ছেন মার্কসবাদীদের 'বিনয় শিখতে হবে, ঐতিহ্যকে বা বর্তমান সমস্যাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার দম্ভ ত্যাগ করতে হবে, মানুষকে ভালোবাসতে হবে। The C.P.I. does not understand the mind of India.' দ্বিতীয়ত, মায়ের করুণাভিক্ষা চাইছেন বটে। কিন্তু একইসঙ্গে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে

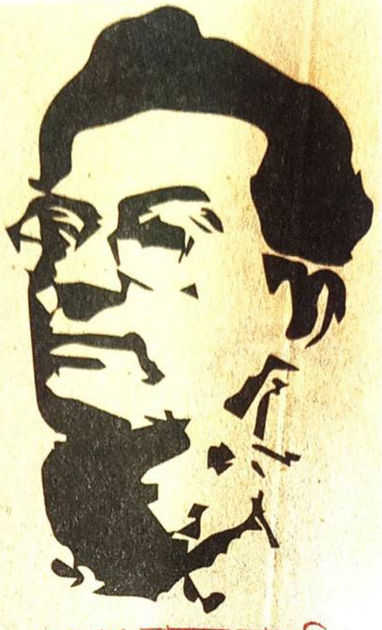

১৯৫৫ সালের ডায়েরি মূলত তাঁর হাসপাতালে দিনযাপনের পঞ্জি। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অতুল গুপ্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সুলেখা সান্যাল, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, মুজফ্ফর আহমেদ—সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বৃত্তের প্রচুর শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে তাঁর কথালাপের প্রসঙ্গ বারবার ঘুরেফিরে এসেছে।

চিরদিন অহংকার করে আসা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বেডে শুয়ে লিখছেন—'যদি পারি পুরানো শাস্ত্রসংস্কার বিশ্বাসের গণ্ডী ভেঙে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাশক্তিকে নিয়ে একখানা বই লিখব। সেকেলে মাকে একেলে করার সাধ—' নিছকই ভাবতন্ময়তার ঘোরে উন্মাদ হয়ে পড়েননি মানিক।

চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোনও এক শক্তিকে আঁকড়ে দিশা ফিরে পেতে চেয়েছেন। আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার ও সংশোধনের রাস্তা খুঁজতে চেয়েছেন। কিন্তু তার জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আবিল হয়নি, সাম্যের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি।

১৯৫৫ সালের ডায়েরি মূলত তাঁর হাসপাতালে (ইসলামিয়া হাসপাতাল ও লুম্বিনী পার্ক মানসিক চিকিৎসালয়) দিনযাপনের পঞ্জি। ব্যাধি, আসক্তি আর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াইয়ের শেষ পর্ব। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অতুল গুপ্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সুলেখা সান্যাল, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, মুজফ্ফর আহমেদ—সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বৃত্তের প্রচুর শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে তাঁর কথালাপের প্রসঙ্গ বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। চিকিৎসা পদ্ধতির বিবরণ, পথ্যের তালিকায় দিনলিপি আকীর্ণ।

এসবের মধ্যেও মানিক উপন্যাস ('পরাধীন প্রেম') লিখছেন, প্রুফ দেখছেন। কেউ একদিন দেখা না করতে এলে ব্যাকুল হয়েছেন। একই সঙ্গে উপভোগ করছেন প্রাণান্তকর দৌড়ঝাঁপ থেকে ক্ষণিকের মুক্তি—'কী সুমিষ্ট মধুর এই চিন্তাহীন স্বাধীন পরিপূর্ণ বিশ্রাম!' অ্যালকোহলের আসক্তি তিনি ছাড়তে পারেননি (ছাড়া সম্ভবও ছিল না)। দারোয়ান, নার্স, ডাক্তারদের চোখে ধুলো দিয়ে, মিথ্যে বলে বাইরে থেকে মদ কিনে এনেছেন। কখনও থলিতে ভরে, কখনও কাগজে মুড়ে। ফিরে এসে ডায়েরিতে লিখেছেন সবটুকু। শিশুসুলভ অপরাধবোধে লেখা সেই এন্ট্রিগুলি আমাদের বিষণ্ণ করে। ট্র্যাজেডির শেষটুকু স্থির। প্রিয় নায়ক ধীরে ধীরে কবে কীভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন, কীভাবে জমতে থাকবে 'পাথরের ফুল'—সবকিছু জানা। তাই হয়তো এই স্খলন-বিচ্যুতি (hamartia) গোটা গোটা অক্ষরে মুদ্রিত দেখার যন্ত্রণা হৃদয়ে এক অসাড় সন্তাপের জন্ম দেয়। সেই শোক ঘনীভূত হয় তাঁর শেষ লেখায় (২৯ নভেম্বর, ১৯৫৬)। সর্ষের তেল, হলুদ, মুসুর, মুগ, বিউলির ডাল, মাছ, লেবু, বিড়ি, সিগারেটের পাই পয়সার গোছানো হিসেব।

লড়াই থেমে যায়নি... চিন্তাভারাতুর মস্তিষ্ক এখনও সচল। সংসার খরচা মিটিয়ে, পাঞ্জাবির আস্তিন গুটিয়ে এই বুঝি নতুন কোনও গল্পের প্লট লিখতে বসবেন তিনি... 'এ দেশের দরিদ্রতম বড় লেখক' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

• ***গ্রন্থঋণ: অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (ডায়েরি ও চিঠিপত্র)।***

বিষ্ণুলোকে সন্ধ্যা নামে

পর্ব-৪৩

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

আগে যা ঘটেছে...

নাতাশাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সকলে মিলে নাতাশাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। স্বাগতর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে চত্বর থেকে নেমে জঙ্গলের রাস্তায় প্রবেশ করল সবাই। রাতভর বৃষ্টির পর সকালের ঝলমলে আলোর স্পর্শে পাখিরা আনন্দে মেতে উঠেছে।

বেশ খানিকক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজির পরও নাতাশাকে পাওয়া গেল না। এত সুন্দর সকাল, কিন্তু অজানা আশঙ্কাতে ধীরে ধীরে সকলের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। একসময় প্রফেসর বললেন, ‘এখানে সে নেই বলেই তো মনে হচ্ছে। চল এবার মন্দিরের দিকে ফেরা যাক। তোমরা যখন অন্যদিকে গিয়েছিলে তখন যদি সে মন্দিরে ফিরে এসে থাকে?’

প্রফেসরের কথা শোনার পর দ্রুত মন্দিরের দিকে এগল সকলে। কিন্তু চত্বরে উঠে তারা দেখল নাতাশা ফিরে আসেনি। চত্বরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রফেসর চিন্তিতভাবে বললেন, ‘মেয়েটা কোথায় গেল বল তো?’

বিক্রম বলল, ‘একবার সবাই মিলে মন্দিরের ভিতরে গিয়ে খুঁজে আসি স্যর?’

প্রফেসর বললেন, ‘নাতাশা কি একলা মন্দিরের ভিতর ঢুকতে সাহস করবে?’

তাঁর কথায় সুরভীও বলল, ‘নাতাশা কিছুতেই একলা মন্দিরে ঢুকবে না।’

কিন্তু প্রীতম বলল, ‘আশপাশের সব জায়গাতেই যখন ওকে খুঁজে এলাম, তখন একবার মন্দিরের ভিতরে ঢুকে দেখাও ভালো। এমন তো হতে পারে যে, ঘর থেকে বেরিয়ে কোনও কারণে মন্দিরে ঢুকেছিল অথবা ঢুকতে বাধ্য হয়েছিল, এখন বেরতে পারছে না অথবা ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছে।’

প্রীতমের কথাটা স্বাগত একেবারে উড়িয়ে দিতে পারল না। কত অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত ব্যাপারই তো এখানে ঘটছে! তাই সে প্রীতমকে সমর্থন জানিয়ে বলল, ‘আমারও মনে হয় মন্দিরের ভিতরটা একবার দেখে আসা দরকার।’

সে এ কথা বলার পর প্রফেসর রামমূর্তি যেন কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললেন, ‘বলছ যখন চল।’

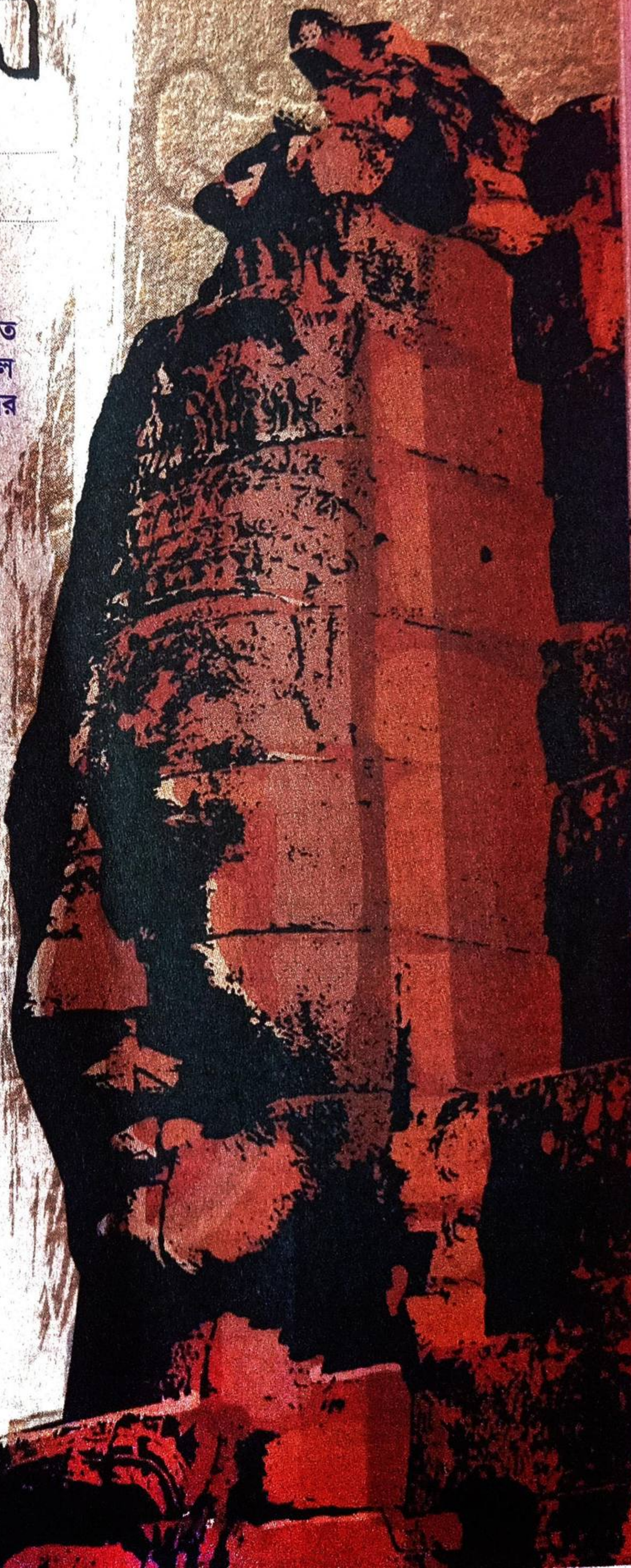

বিক্রম ছুটে গিয়ে ঘর থেকে একটা টর্চ আর লাঠি নিয়ে এল। তারপর তারা এগল তোরণের দিকে।

বিষ্ণুর মুখমণ্ডল বসানো সেই প্রাচীন তোরণ অতিক্রম করে তারা পা রাখল ভিতরের প্রাঙ্গণে। জায়গাটা সূর্যালোকে আলোকিত হলেও সেখানে জল এখনও শুকায়নি। স্বাগতদের কাজ করার পর সাজিয়ে রাখা মূর্তি, মূর্তির খণ্ডাংশগুলো ভিজে অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। তার আড়াল থেকে ব্যাঙ ডাকছে। প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুরভী বেশ কয়েকবার নাতাশার নাম ধরে ডাকল। সেই ডাক মন্দিরের ভিতর দিক থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। নাতাশার কোনও সাড়া মিলল না। এরপর তারা প্রবেশ করল মন্দিরের ভিতরে যাওয়ার জন্য ভগ্ন কক্ষগুলোর মধ্যে। ছাদ থেকে জল চুঁইয়ে সেই পাথরের ঘরগুলোর মধ্যে পড়েছে। টর্চের আলো ফেলে ঘরগুলো দেখতে দেখতে একসময় তারা ভিতরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল। মূল মন্দিরের তাকিয়ে স্বাগতরা বেশ কয়েকবার নাতাশার নাম ধরে ডাক দিল। কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর চারপাশের স্থাপত্যে প্রতিধ্বনিত হল শুধু। এবারও তার সাড়া মিলল না। স্বাগতরা এবার মূল মন্দিরের ভিতরে ঢুকে তাকে খুঁজতে শুরু করল। এক সময় তারা উঠে এসে উপস্থিত হল সেই জায়গাতে যেখানে দেওয়ালের গায়ে একটা শূন্য জায়গাকে কেন্দ্র করে রচিত আছে মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণদের প্রাচীন মূর্তিগুলো। যেখানে পড়েছিল সেই অঙ্গরার প্রাচীন পাথুরে মুণ্ডটা। যার আঘাতে হত্যা করা হয়েছিল গাইড ফঙকে। অলিন্দ সেখানেই শেষ। কিছুটা তফাত থেকে ছাদে ওঠার সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। তা বেয়ে ওপর থেকে জমা জল নামছে। বিক্রম বলল, 'একবার ছাদে উঠে দেখে আসব নাকি স্যর?'

প্রফেসর বললেন, 'না, ও কাজ কর না। এমনিতেই ধাপগুলো ভাঙা, তার ওপর জল ঝরছে। ওপরে উঠতে গেলে যেকোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আর এই সিঁড়ি বেয়ে নিশ্চয়ই নাতাশার পক্ষে ওপরে ওঠা সম্ভব নয়।'

স্বাগতও কাজটা করতে নিষেধ করল বিক্রমকে। তাদের কথা শুনে বিক্রম সিঁড়ির কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে এল। সুরভী বলল, 'কোথাও তো নাতাশাকে পেলাম না! এবার কী হবে স্যর?'

প্রফেসর চিন্তিতভাবে বললেন, 'চল আগে মন্দির থেকে বেরই। তারপর দেখি কী করা যায়।'

সে স্থান ত্যাগ করে এরপর বাইরে বেরবার রাস্তা ধরল তারা। মন্দির তোরণের বাইরে এসে দাঁড়াল সকলে। বেলা ন'টা বেজে গিয়েছে। চড়া রোদ উঠতে শুরু করেছে। তারা বাইরের চত্বরে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হেরুম এসে হাজির হল। তাকে দেখে সুরভী বলল, 'তুমি তো হেঁটেই মন্দির তোরণ থেকে এখানে আসা যাওয়া কর। আসার পথে তুমি নাতাশা ম্যাডামকে দেখতে পেলে?'

হেরুম জবাব দিল, 'না, তাঁকে দেখিনি। তিনি কি ওদিকে গিয়েছেন?'

সুরভী বলল, 'তাকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

কথাটা শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল হেরুম। তারপর বলল, 'আপনাদের একটা কথা বলি। আমি এতদিন ভূত-প্রেত অপদেবতায় তেমন বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু চারপাশে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, তাতে আমার মনে হচ্ছে হয়তো বা তেমন কিছু থাকলেও থাকতে পারে। নাতাশা ম্যাডামকে খুঁজে পেলে আমার মনে হয় আপনাদের এ জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। অন্তত আজকের রাতটা আপনাদের শহরে গিয়ে কাটানোই ভালো। বলা যায় না কোনও বিপদ ঘটতে পারে। আপনাদের সঙ্গে এতদিন ধরে কাজ করতে করতে আপনাদের ভালোবেসে ফেলেছি আমি। অপরাধ নেবেন না, তাই এ কথাগুলো বললাম।'

প্রীতম জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বিশেষ করে আজকের দিনটার কথা বলছ কেন?'

হেরুম বলল, 'এই মন্দিরনগরীতে রাতে তো প্রায় কোনও মানুষই থাকে না। হাতেগোনা কয়েকজন গার্ড বা ওই ধরনের কিছু লোক, বা বিষ্ণু মন্দিরের কয়েকজন লোক থাকে ওই মন্দিরে। কিন্তু তারাও আজকের দিনে বাইরে চলে যায়। আপনাদের কোনও বিপদ ঘটলে সাহায্যের জন্য কাউকে পাবেন না। বিষ্ণুলোকে সন্ধ্যা নামার পর আজ একজন জনপ্রাণীকেও খুঁজে পাবেন না এখানে।'

প্রীতম আবার প্রশ্ন করল, 'কেন? তারাও চলে যায় কেন?'

হেরুম বলল, 'আজ আষাঢ় পূর্ণিমা। এখানকার মানুষের বিশ্বাস, যে সব খারাপ শক্তি এখানে থাকে তারা এই আষাঢ় পূর্ণিমার দিন একসঙ্গে মিলিত হয়ে বিষ্ণুলোকের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়। তোরণ ভেঙে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করে যাতে তাদের মুক্তি লাভ হয় সে জন্য। তারা যাতে বিষ্ণুলোকে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য আজ তোরণের সামনে পুজো করে গণ্ডি কেটে দুপুরবেলার পর তোরণ ভালো করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিষ্ণুলোকের ভিতর প্রবেশ করতে না পেরে প্রেতাত্মারা নাকি ভয়ঙ্কর খেপে ওঠে। তখন তারা কোনও মানুষকে পেলে নিজেদের দলে টানার চেষ্টা করে। অর্থাৎ মেরে ফেলে।'

তার কথা শুনে কেউ আর কোনও মন্তব্য করল না। হেরুমের কথা শুনে মনে হল ভূত চতুর্দশী বা হ্যালুইন নাইটের মতো ব্যাপার তাহলে সব দেশেই আছে। যে রাতে প্রেতাত্মারা জেগে ওঠে বলে মনে করা হয়। শুধু স্থানকাল ভেদে এ দিনের উদ্‌যাপন পদ্ধতি বা ধর্মীয় রীতি আলাদা।

সুরভী প্রফেসরকে বলল, 'নাতাশাকে খোঁজার ব্যাপারে এবার কী করবেন বলুন?'

রামমূর্তি বললেন, 'সেটাই তো ভাবছি।'

প্রীতম বলল, 'সুরভী পাঁচটার সময় ঘুম ভেঙে দেখেছে নাতাশা ঘরে নেই। যদি নাতাশা ভোরের আলো ফোটার পরও ঘর ছেড়ে থাকে তাহলে অন্তত চার ঘণ্টা হয়ে গেল তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার মনে হয় এবার ব্যাপারটা আমাদের পুলিসকে জানানো উচিত।'

সুরভী বলল, 'হ্যাঁ স্যর, আমারও তাই মনে হয়।'

হেরম্ব বলল, 'পুলিসের বড় সাহেব তো এদিকেই এসেছেন। একটু আগে আমি যখন আসছি, তখন দেখলাম তাঁর গাড়ি বিষ্ণুলোকের দিকে গেল।'

প্রফেসর তাঁর পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ডায়াল করলেন পুলিসকর্তা বাকুমকে। তাঁকে ফোনে ধরার পর রামমূর্তি ঘটনাটা ব্যক্ত করলেন। তারপর তিনি ফোনের লাইন কেটে দিয়ে বললেন, 'বাকুম জানালেন তিনি বিষ্ণুলোকে আছেন। তিনি এখনই রওনা হচ্ছেন এখানে আসার জন্য।'

খুব চড়া রোদ উঠতে শুরু করেছে। সবাই তাই তোরণের নীচে ছায়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল পুলিসের আসার জন্য। পিছনে মন্দিরের ভিতরটা কেমন যেন থমথম করছে। কড়া রোদ ওঠার পর ব্যাঙের ডাক থেমে গিয়েছে। নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে সবাই সম্ভবত একই কথাই ভাবতে লাগল যে, নাতাশা কোথায় অদৃশ্য হল? আর তার সঙ্গে খারাপ কিছু ঘটেছে কি না সে আশঙ্কাও দানা বাঁধতে শুরু করল স্বাগতদের মনে। সুরভী শুধু একবার বলল, 'নাতাশার যতক্ষণ খোঁজ না মিলছে, ততক্ষণ কিন্তু আমি এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যাব না।'

আধ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিসকর্তা বাকুম এসে উপস্থিত হলেন তার কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে। তিনি চত্বরে উঠে আসার পর স্বাগতরা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তিনি বললেন, 'ব্যাপারটা আমাকে একটু খুলে বলুন।'

প্রফেসর আর সুরভী মিলে মোটামুটি বিস্তারিতভাবেই তাঁকে বলল নাতাশার নিখোঁজ হওয়া ও তাকে খুঁজে না পাওয়ার ব্যাপারটা। মন দিয়ে সব কথা শোনার পর বাকুম জানতে চাইলেন, 'কেউ কি তাকে কিডন্যাপড করেছে বলে মনে হয়? কিন্তু দিনের আলো ফোটার পর এই চত্বর থেকে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া মনে হয় যুক্তিসঙ্গত নয়। অবশ্য ব্যাপারটা যদি রাতে ঘটে থাকে তবে তা হতে পারে।'

প্রফেসর বললেন, 'আমরা ঠিক কেউ বুঝে উঠতে পারছি না, তার কী ঘটেছে। কীভাবে সে নিখোঁজ হল।'

সুরভী বলল, 'কিন্তু রাতের বেলা কখনওই সে একলা বাইরে বেরত না। যদি কোনও দিন বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হতো তাহলেও আমার ঘুম ভাঙিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেত। সন্ধ্যা নামার পর বাইরে বেরতে ভয় পেত সে।'

'কীসের ভয়?' জানতে চাইলেন বাকুম।

'ভূতের ভয়। এখানকার স্থানীয় লোকরা যে সব কথা বলে সে সব শুনে আর খুনের ব্যাপার ঘটার পর ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে।' প্রীতম বলল।

বাকুম আবার প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে কি তিনি এ জায়গায় থাকতে চাইছিলেন না?'

সুরভী বলল, 'হ্যাঁ, সে আর এখানে থাকতে চাইছিল না। দেশে ফিরে যেতে চাইছিল।'

প্রফেসর বললেন, 'আমি হয়তো সে ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু আপনার নিষেধাজ্ঞার কারণে তাকে দেশে পাঠানো সম্ভব হয়নি।'

অফিসার বললেন, 'এমনও তো হতে পারে যে, তিনি নিজেই এ জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছেন?'

বিক্রম এবার বলে ফেলল, 'কাল রাতে ঘুম চোখে জানলার বাইরে তাকিয়ে আমি যেন দেখেছিলাম যে, একজন কেউ এই চত্বর ছেড়ে জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে।'

কথাটা শুনে বাকুম সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এ কথাটা আগে বলেননি কেন? তাহলে হয়তো সেই মহিলা তিনিই ছিলেন?'

সুরভী কথাটার মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, 'যে সন্ধ্যার পর একলা ঘরের বাইরে বেরতে ভয় পায় সে মাঝরাতে জঙ্গলে ঢুকবে এ কথাটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

বাকুম বললেন, 'আমার পুলিস জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, অত্যাধিক ভয় পেলে মানুষ এমন সব কাজ করে বসে, যা সাধারণ অবস্থায় বা সামান্য ভয় পেলেও সে করতে পারত না।'

পুলিস অফিসার বাকুমের এ যুক্তিটাও মনে ধরল না সুরভীর। সে বলল, 'কিন্তু সে একলা একলা অন্য জায়গায় চলে যাবে তা কি সম্ভব? এ জায়গা তার পরিচিত নয়। তাকে যতটুকু চিনেছি তাতে একলা দেশে ফেরাও কার্যত অসম্ভব। আমাদের সঙ্গে সে এই প্রথম দেশের বাইরে পা রেখেছে।'

সুরভীর কথা শুনে বাকুম একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু এ কাজে যদি কেউ তাকে সাহায্য করে থাকে? এখানে অন্য কারও সঙ্গে কি তার

প্রফেসর তাঁর পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ডায়াল করলেন পুলিসকর্তা বাকুমকে। তাঁকে ফোনে ধরার পর রামমূর্তি ঘটনাটা ব্যক্ত করলেন। তারপর তিনি ফোনের লাইন কেটে দিয়ে বললেন, 'বাকুম জানালেন তিনি বিষ্ণুলোকে আছেন। তিনি এখনই রওনা হচ্ছেন এখানে আসার জন্য।'

পরিচয় হয়েছিল? কেউ কি এর মধ্যে এখানে এসেছিল? যার সঙ্গে মিস নাতাশার কথা হয়ে থাকতে পারে?'

সুরভী বলল, 'এ দেশে আসার পর আমাদের মতোই তিন-চারজনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। মিস্টার নারেঙ খাম, কুমির খামারের মালিক বুল আর ওই গাইড ফঙ।'

পুলিসকর্তা জানতে চাইলেন, 'প্রথম দু'জনের সঙ্গে কি তার ইদানীং কথাবার্তা হয়েছিল?'

সুরভী বলল, 'কাল সকালে নারেঙ খাম এসেছিলেন। তখন আমি আর নাতাশাই এখানে ছিলাম।'

বাকুম বললেন, 'নারেঙ খামের সঙ্গে তার কি এমন কোনও কথাবার্তা হয়েছিল, যা আপনার অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল?'

জেরার উত্তরে সুরভী প্রথমে বলল, 'না, তেমন কোনও কথা তো হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে না। নাতাশা কাল খুনের ঘটনাটা শুনে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। নারেঙ শুনে বললেন, চারপাশের পরিবেশ তারও ভালো বলে মনে হচ্ছে না। তিনি জানালেন, আজ তিনি দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। তারপর সাধারণ টুকটাক দু-একটা কথাবার্তা বলে চলে গেলেন।'

এ কথা বলে, সুরভী একটু যেন ভেবে নিয়ে বলল, 'ও হ্যাঁ। নারেঙ আমার কাছে জল খেতে চেয়েছিলেন। আমি ঘরে গিয়ে জলের বোতল এনে দিলাম। সেই দু-তিন মিনিটের মধ্যে যদি তাদের দু'জনের মধ্যে কোনও কথা হয়ে থাকে, তবে তা আমার জানা নেই।'

'নারেঙকে কি মিস নাতাশা পছন্দ করতেন?' আবার প্রশ্ন করলেন বাকুম।

প্রশ্ন শুনে একটু ইতস্তত করে সুরভী উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, তবে

প্রফেসর আর সুরভীর যৌথ কথার আক্রমণে যেন একটু চাপে পড়ে গেলেন পুলিসকর্তা। একটু ভেবে নিয়ে তিনি মোবাইল ফোন বার করে ডায়াল করলেন। তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'দেখুন তো আজ ভোরের ফ্লাইটে নারেঙ খাম নামের কেউ নমপেন রওনা হয়েছেন কি না?

তার পিছনে একটা কারণও আছে। আমাদের সঙ্গে নারেঙ খামের পরিচয় হয় নমপেনের কিলিং ফিল্ডে। সেখানে হত্যাকাণ্ডের স্মারকগুলো দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে নাতাশা। নারেঙ সেখানে তখন উপস্থিত হয়ে স্মেলিং সল্ট দিয়ে নাতাশার জ্ঞান ফেরান। তার ভয় কাটাবার চেষ্টাও করেন।'

সুরভীর কথাতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল বিক্রম আর প্রীতম। বাকুম বললেন, 'নারেঙ কাল বিকালে আমার অফিসেও এসেছিল যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। আজ ভোরের ফ্লাইটে তার নমপেন যাওয়ার কথা। তারপর সেখান থেকে ফ্লাইটে প্যারিস ফেরার কথা।'

কথাটা শুনেই প্রফেসর বললেন, 'নারেঙকে আমাদের মতো আপনি দেশ ছাড়তে নিষেধ করেননি? ফঙ তো তার সঙ্গেই ঘুরত। সকলের ক্ষেত্রেই তো একই নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ হওয়া উচিত।'

এ কথাটা শুনে পুলিসকর্তা যেন মৃদু অস্বস্তিবোধ করলেন। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তাকেও আমি মৌখিকভাবে আপাতত দেশ ছাড়তে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু নারেঙের সরকারি ওপর মহলের সঙ্গে যোগাযোগ। ওপরতলা থেকে আমার কাছে ফোন এল। তারা বলল, নারেঙের সঙ্গে ফঙের হত্যাকাণ্ডের যেহেতু কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ পুলিসের হাতে আসেনি, তাই তাকে আটকে রাখা যাবে না। সে এদেশের সঙ্গে ব্যবসা করতে চায়। তাকে আটকে রাখলে ফরেন ইনভেস্টরদের কাছে ভুল বার্তা যাবে। এ দেশটা গরিব দেশ। আমাদের টাকার দরকার। আমি সরকারি কর্মচারী। ওপরতলার নির্দেশের পর তাকে আটকানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।'

প্রফেসর এবার খানিক উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, 'আমারও তাহলে উপর মহলে কথা বলা উচিত ছিল বা উচিত হবে। আমরাও কিন্তু ভারতীয়। আর আমরা এখানে বেড়াতে আসিনি। আপনাদের সরকারের অনুরোধে আপনাদের সাহায্য করতে এসেছি।'

সুরভীও এবার বেশ উত্তেজিত ভঙ্গিতে পুলিস অফিসারের উদ্দেশে বলল, 'যেভাবেই হোক নাতাশাকে আজকেই আমাদের খুঁজে দিতে হবে। সে এখানেই নিশ্চয়ই কোথাও আছে। আমরা ব্যাপারটা ভারতীয় দূতাবাসকে জানাব। প্রয়োজনে পুলিসের সম্পর্কে কমপ্লেন করব। আপনার নিষেধাজ্ঞার জন্যই তাকে দেশে পাঠানো যায়নি। তার যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে তার দায় আপনার ওপরেও বর্তাবে।'

স্বাগতর মনে হল, প্রফেসর আর সুরভীর যৌথ আক্রমণে যেন একটু চাপে পড়ে গেলেন পুলিসকর্তা। একটু ভেবে নিয়ে তিনি মোবাইল ফোন বের করে ডায়াল করলেন। তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'দেখুন তো আজ ভোরের ফ্লাইটে নারেঙ খাম নামের কেউ নমপেন রওনা হয়েছেন কি না? সে জন্মসূত্র এদেশের নাগরিক, কিন্তু বর্তমানে ফ্রান্সের নাগরিক। আর দেখুন নাতাশা নামের ভারতীয় পাসপোর্টধারী যুবতী তার সঙ্গে একই ফ্লাইটে নমপেন বা অন্যত্র অন্য কোনও ফ্লাইটে রওনা হয়েছে কি না? যে বিমান ছাড়বে তার প্যাসেঞ্জার লিস্টেও যদি যুবতীর নাম থেকে থাকে তবে তাকে ফ্লাইটে উঠতে দেবেন না। আমাকে যথাসম্ভব দ্রুত খবরগুলো পাঠান।' এ কথা বলার পর ওপাশের লোকটার সঙ্গে আরও দু-চারটে কথা বলে ফোন রেখে দিলেন বাকুম।

এরপর তিনি প্রথমে সুরভীর উদ্দেশে বললেন, 'এয়ারপোর্টে আমাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিস অফিসারের সঙ্গে কথা বললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবরটা চলে আসবে। আপনি মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন ম্যাডাম। তাকে খোঁজার জন্য যা চেষ্টা করার করব। আশা করি, তার কোনও খোঁজ মিলবে।' এ কথা বলার তিনি প্রফেসরকে বললেন, মিস নাতাশার ছবি আছে নিশ্চয়ই। সেটা আমাকে দিন।'

প্রফেসর বলল, 'হ্যাঁ, আমার মোবাইলে ওর আইডেন্টিটি কার্ডের কপি আছে। যেখানে ওর নাম, বয়স, ছবি সবকিছু আছে। আপনার ই-মেল অ্যাড্রেস বলুন, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

প্রফেসর রামমূর্তি বাকুমের থেকে ই-মেল অ্যাড্রেস নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই নাতাশার আইডেন্টিটি কার্ডের কপি পাঠিয়ে দিলেন।

পুলিস অফিসার বললেন, 'সরকারিভাবে আমাকে একটা

মিসিং কমপ্লেনও করতে হবে। ই-মেলও করতে পারেন। সেটা করে দিন।'

রোদের তেজ প্রচণ্ড বেড়েছে। কে বলবে গতকাল বিকেল থেকে শেষ রাত পর্যন্ত এখানে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। খোলা আকাশের নীচে আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই ঘেমে উঠেছে সবাই। বিক্রম তাই বলল, 'চলুন, আমরা তোরণের ছায়ার তলায় গিয়ে দাঁড়াই।'

সেই মতো সকলে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। প্রফেসর তাঁর মোবাইলে কমপ্লেন লেটার টাইপ করতে শুরু করলেন ই-মেল করার জন্য। বাকুম তাঁর সহকর্মীকে নির্দেশ দিলেন খবরটা অন্যত্র জানাবার জন্য। তাঁর নির্দেশ পালন করে সেই পুলিসকর্মী তাঁর ওয়াকিটকির মাধ্যমে মন্দিরনগরীতে কর্মরত ও অন্যত্র খবরটা জানাতে লাগলেন।

বাকুম তোরণের ভিতর দিকে তাকালেন। তারপর তোরণ অতিক্রম করে এগলেন ভিতরের প্রাঙ্গণের দিকে। স্বাগত আর প্রীতমও এগল তাঁর সঙ্গে। প্রাঙ্গণের ভিতরে ঢুকে তিনি বললেন, 'মন্দিরটা আপনারা ভালো করে খুঁজে দেখেছেন তো?'

বিক্রম বলল, 'হ্যাঁ, ভালো করে খুঁজে দেখেছি সে নেই।'

বাকুম এরপর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন চত্বরের এক জায়গায়। যেখানে ভাঙা মূর্তিগুলো রেখেছিল স্বাগতরা। প্রাচীন মূর্তিগুলির নানা দেহাংশ। একটা নারী মূর্তির মুণ্ড দেখিয়ে বাকুম বললেন, 'ঠিক এমনই একটা পাথরের মুণ্ডর আঘাতে হোয়াঙকে খুন করা হয়েছে। আমার কিন্তু বিশ্বাস ওই মুণ্ডটা এ মন্দির থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে।'

এরপর তিনি বললেন, 'হোয়াঙের গাড়িটা উদ্ধার হয়েছে। বিষ্ণুলোকের কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে সেটা পাওয়া গিয়েছে।'

কিছুক্ষণ প্রাঙ্গণের ভিতর ঘোরাঘুরির পর সবাই আবার তোরণের নীচে ফিরে এল। প্রফেসর পুলিস অফিসারকে বললেন, 'ই-মেলটা আপনাকে পাঠিয়ে দিলাম।'

এরপরই এয়ারপোর্ট থেকে ফোন এল বাকুমের মোবাইলে। সিয়েমরিপ এয়ারপোর্ট ছোট এয়ারপোর্ট, খুব বেশি বিমান সারা দিনে ওঠানামা করে না। তার ওপর এখন সবকিছুই কম্পিউটার সিস্টেমের আওতায়। তাই খবর সংগ্রহ করতে বিশেষ দেরি হয়নি।

বাকুম ওপাশের পুলিসকর্মীর থেকে কথা শুনে নেওয়ার পর স্বাগতদের বললেন, 'সকাল ন'টা পর্যন্ত মাত্র তিনটে ফ্লাইট ছেড়েছে। তার প্যাসেঞ্জার লিস্টে বা যে বিমানগুলো আজ উড়বে তার প্যাসেঞ্জার লিস্টে মিস নাতাশার নাম নেই।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সুরভী বলল, 'আমি জানতাম থাকবে না। কারণ সে তার পাসপোর্ট আমার কাছে রাখতে দিয়েছিল। সেই ব্যাগ আমার ঘরেই আছে।'

বাকুম বললেন, 'তবে নারেঙ খামের চলে যাওয়ার ব্যাপারটা সত্যি। আজ ভোরের ফ্লাইটে তিনি নমপেন রওনা হয়েছেন।' এ কথা বলার পর তিনি বললেন, 'দেখি তো তাঁকে ফোনে পাওয়া যায় কি না?'

নারেঙ খামের নাম্বার ডায়াল করে তিনি সেটা কানে ধরে তারপর তা নামিয়ে বললেন, 'ফোন ডেড। সম্ভবত তিনি ফ্রান্সে ফেরার ফ্লাইটে উঠে পড়েছেন। এবারে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গেল যে তার সঙ্গে নাতাশা যায়নি।'

সুরভী বলল, 'তবে তো সে এখানেই কোথাও আছে। খুঁজে বের করুন তাকে।'

বাকুম বললেন, 'সে চেষ্টা যে আমি করছি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। তবে ইচ্ছা হলে আপনারা আজ থেকে সিয়েমরিপে গিয়ে থাকতে পারেন। প্রয়োজন হলে আমি থাকার ব্যবস্থা করে দেব।'

প্রস্তাবটা শুনে রামমূর্তি স্বাগতর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি না হয় এখানে থেকে গেলাম। আর তোমরা না হয় সিয়েমরিপে গিয়ে থাকলে? তোমার কী মত?'

স্বাগত কিছু জবাব দেবার আগে সুরভী দৃঢ়ভাবে বলল, 'যতক্ষণ না নাতাশার খোঁজ মিলছে, ততক্ষণ সবাই এ জায়গা থেকে চলে গেলেও আমি কিন্তু যাব না। আমি নাতাশার সঙ্গে একসঙ্গে এ জায়গায় এসেছিলাম। ওকে না নিয়ে আমি এখান থেকে কোথাও ফিরব না।'

বিক্রমও বলল, 'হ্যাঁ, এমন হল যে সে এখানেই ফিরে এল। আমার মনে হয় আমাদের এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না।'

স্বাগতও একই ভাবনা ভাবল। তাই সে পুলিসকর্তা আর রামমূর্তি স্যারের উদ্দেশে বলল, 'আমাদের এখানেই থাকা ভালো।'

রামমূর্তি স্যার বললেন, 'তবে তাই হোক।'

বাকুম একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আসলে আজকের রাতে এখানে কেউ থাকে না। এমনকী আমার ফোর্সের লোকজনও থাকতে চায় না। বংশ পরম্পরায় এ প্রথা বা নিয়ম চলে আসছে এখানে। তাই নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আপনাদের সিয়েমরিপ যাওয়ার কথা বলেছিলাম। ঠিক আছে দেখা যাক কী করতে পারি। আমি যাই। ভালো করে চারপাশটা খোঁজার চেষ্টা করি। প্রয়োজনে আবার আসব। আপনারা কোনও ইনফরমেশন পেলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন।'

প্রফেসর বললেন, 'আচ্ছা।'

পুলিশকর্তা বাকুম তাঁর কর্মীদের নিয়ে চলে যাওয়ার পর প্রফেসর বললেন, 'এখানে থাকলে খেতে তো হবে কিছু। কাল রাতেও তো তেমন কিছু খাওয়া হয়নি কারও। হেরুম তুমি রান্নাটা করে দিয়ে যাও।'

প্রফেসরের নির্দেশ মেনে হেরুম তার দায়িত্ব পালনের জন্য এগল।

রামমূর্তি এরপর বললেন, 'আমি ঘরে যাচ্ছি। একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবার চেষ্টা করি কোথায় গেল মেয়েটা? তিনি ঘরের দিকে এগবার পর সুরভীও তার ঘরের দিকে এগল। তোরণের নীচে বসে রইল বিক্রম, প্রীতম আর স্বাগত। চুপ করে বসে তারা যে যার মতো ভাবার চেষ্টা করতে লাগল নাতাশা কোথায় গিয়ে থাকতে পারে। বেলা দুপুরের দিকে এগতে শুরু করল।

খানিক বাদে প্রীতম বলল, 'ঘরে গিয়ে একটু শুয়ে নিই। গতকাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি, তারপর আজ এই ঘটনা। শরীর ও মন দুটোই খুব ক্লান্ত লাগছে। একটু রেস্টের দরকার।'

প্রীতম ঘরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই বিক্রমও উঠে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময় সুরভী তার ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে একটু উত্তেজিতভাবে এগিয়ে আসতে লাগল।

স্বাগতদের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর উত্তেজিতভাবে বলল, 'পুলিস অফিসারকে বলেছিলাম নাতাশার পাসপোর্ট ইত্যাদি কাগজপত্র আমার কাছেই আছে। কিন্তু এখন দেখছি নেই!'

'নেই মানে?' বিক্রম প্রশ্ন করল।

সুরভী বলল, 'ঘরে ঢুকে অন্য প্রয়োজনে আমি আমার ব্যাগটা খুলেছিলাম। তার মধ্যে একটা পাউচ ব্যাগে নাতাশার পাসপোর্ট ছিল। এখন দেখছি ব্যাগটা নেই! ঘরের ভিতরও ভালো করে খুঁজলাম, কোথাও পেলাম না!'

স্বাগতরা সবাই বিস্মিত হল। প্রীতম বলে উঠল, 'তার মানে কি নাতাশা স্বেচ্ছায় আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে?'

স্বাগতর মনেও এই একই প্রশ্নই জাগল। বিক্রম বলল, 'কিন্তু প্যাসেঞ্জার লিস্টে তো নাতাশার নাম নেই বলল পুলিস অফিসার! নাতাশা যদি নিজে থেকে চলে গিয়ে থাকে তবে তো সে যথাসম্ভব দ্রুত এ জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে?'

প্রীতম এবার একটা নতুন ভাবনার কথা বলল, 'এমনও তো হতে পারে যে, আমরা যেভাবে এখানে এসেছি অর্থাৎ সড়ক পথে সে নমপেন গিয়েছে, সেখান থেকে সে ফ্লাইট ধরার চেষ্টা করবে?'

স্বাগত বলল, 'যাই হোক ব্যাপারটা রামমূর্তি স্যরকে এখনই জানানো দরকার।'

সকলে মিলে তারা এগল রামমূর্তি স্যরের ঘরের দিকে। তিনি দরজা খুলে বাইরে বেরবার পর সুরভী কথাটা জানাল তাকে। কথাটা শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন বাকুমকে।

তাঁকে সঙ্গে দু-এক মিনিট কথাবার্তা বলে ফোন রেখে রামমূর্তি স্বাগতদের বললেন, 'বাকুম বলছেন তিনিও নাকি এমনই অনুমান করছিলেন। তাঁর অনুমান নাতাশা কোনও দুর্ঘটনার কবলে পড়েনি বা কেউ তাকে অপহরণ করেনি। এটা একটা আশার ব্যাপার। সে হয়তো আবার মত বদলে ফিরে আসতে পারে। বাকুম বললেন তিনি নমপেন এয়ারপোর্টেও ব্যাপারটা জানিয়ে রাখছেন। দেখা যাক কী হয়।'

এ কথা বলে তিনি স্বাগতকে বললেন, 'হেরুমকে বল যে যেন সবার ঘরেই খাবার পৌঁছে দেয়।' এ কথা বলে তিনি সম্ভবত ঘরের ভিতর ঢুকতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় সাইকেলের বেলের টিংটিং শব্দ শুনে তারা দেখল একজন সাইকেল নিয়ে ইতিমধ্যে চত্বরে ঢুকে পড়েছে। তার সাইকেলের পিছনে থার্মোকলের বাক্স, দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তালের রস বিক্রেতা। তবে যে লোকটা রস বিক্রি করতে আসে এ লোকটা সে লোক নয়। তাকে দেখে বিক্রম বলল, 'আমি মনে মনে ভাবছিলাম, এমন কেউ যদি আসে তবে ভালো হয়।'

প্রফেসরও যেন কিছুটা উৎসাহ প্রকাশ করে বললেন, 'হ্যাঁ, শরীরটা একটু ঠান্ডা করা দরকার। তাছাড়া স্নায়ুর চাপও কিছুটা কমাতে সাহায্য করবে।'

রস বিক্রেতা এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। তারপর বাক্সর ঢাকা খুলে বোতলগুলো দেখিয়ে বলল, 'খুব ভালো পানীয়। মাত্র এক ডলার।'

বিক্রম বলল, 'আমরা অন্য একজনের থেকে এ পানীয় কিনি। যে বায়ুম মন্দিরের দিক থেকে আসে। তোমরা এ পানীয় ভালো হবে তো?'

পাঁচজনের জন্য পাঁচ বোতল পানীয় কেনা হল। আর একটা বোতল পড়েছিল বাক্সে। লোকটা সেটা তুলে ধরে বলল, এটা নিয়ে নিন, পয়সা দিতে হবে না। আমার উপহার। এরপর থেকে আমি মাঝে মাঝে এখানে আসব পানীয় দিতে।'

বলাবাহুল্য বিক্রমই সেই অতিরিক্ত বোতলটা নিল। প্রফেসরই পয়সা মেটালেন। লোকটা সাইকেল নিয়ে চত্বর ছেড়ে চলে গেল। রামমূর্তি বললেন, 'যাও এবার ঘরে ঢুকে পড়।' এই বলে তিনি নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

স্বাগতর তখনই ঘরে ঢোকার ইচ্ছা হল না। সে বলল, 'তোমরা ঘরে গেলে যেতে পার। আমি পরে যাচ্ছি।'

তার কথা শুনে বোতল হাতে যে যার ঘরের দিকে রওনা হল। স্বাগত গিয়ে বসল তোরণের নীচে। তার পিছনে নিস্তব্ধ মন্দির। কিছুক্ষণ সে সেখানে বসে থাকার পর ঘরে ফিরে যাওয়ার আগে একবার মনের খেয়ালে তোরণের ভিতরের চত্বরে গিয়ে দাঁড়াল। চারপাশে কেমন যেন থমথমে পরিবেশ। প্রাচীন ভগ্নপ্রায় মূর্তিগুলো যেন চেয়ে আছে তার দিকে। তাদের দিকে তাকিয়ে স্বাগত মনে মনে ভাবল, 'খামের যুবতী তার গল্পটা শেষ করে যেতে পারল না। জানি না এ মন্দিরের রহস্য উন্মোচিত হবে কি না! এই মূর্তিগুলো যদি কথা বলতে পারত তবে ভালো হতো।'

কয়েক মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর স্বাগত পিছু ফিরল তোরণের বাইরে বেরবার জন্য। সে তোরণের কাছে পৌঁছতেই তার হাতের বোতলটাতে একটা হ্যাঁচকা টান অনুভব করল। কেউ যেন পিছন থেকে ছিনিয়ে নিল বোতলটা। চমকে উঠে পিছনে ফিরে তাকাতেই সে দেখতে পেল সেই বড় বাঁদরীটাকে। বোতলটা ছিনিয়ে সেটা নিয়ে যে দেওয়ালের খাঁজ বেয়ে দ্রুত ছাদের ওপর উঠে গেল। তারপর একবার সে স্বাগতর দিকে মুহূর্তর জন্য ফিরে তাকিয়ে এক লাফে স্বাগতর চোখের আড়ালে বোতল নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্বাগত তোরণের বাইরে বেরিয়ে পড়ল। ভাড়ার ঘরের পাশে ছাউনির নীচে হেরুম রান্না করছিল। সে তাকে বলল সবার ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য। হেরুম সম্মতি জানাবার পর বলল, 'আবারও একবার ভেবে দেখবেন, আজ রাতে এখানে থাকা ঠিক হবে কি না। আজ কিন্তু আষাঢ় পূর্ণিমার রাত!'

স্বাগত তার কথার প্রত্যুত্তর না দিয়ে এগল ঘরের দিকে। নানান ভাবনা ভিড় করছে তার মাথাতে। ***(চলবে)***

ধ্বংসলীলাও উপভোগ্য?

মৃণালকান্তি দাস

স্লাভুটিচ শহরের কেন্দ্রে বিশাল চত্বরের ওয়াচ টাওয়ারটি প্রতি ঘণ্টায় বেজে ওঠে। এক নিমেষে খান খান হয়ে যায় চারপাশের নীরবতা। শান্ত স্কোয়ারটি স্মরণ করিয়ে দেয় উত্তর ইউক্রেনের এই শহরটি আজও জীবিত। এই শহরের বহু নাগরিক দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়ানক পারমাণবিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে। চেরনোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনাই জন্ম দিয়েছিল এই স্লাভুটিচ শহরের।

১৯৮৬ সালের ২৬ এপ্রিল ভয়াবহ পারমাণবিক দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়ে যায় প্রেপিয়াত শহর। শহরের ৪৫ হাজার মানুষ ভিটে ছাড়া হয়। জীবন্ত প্রেপিয়াত পরিণত হয় এক ভূতুড়ে শহরে। বিস্ফোরণের পর মানুষজন যখন প্রেপিয়াত ছেড়ে যাচ্ছিল, তখন সোভিয়েত কর্তারা তাদের বলেছিলেন, তারা তিনদিন পরই নিজেদের ঘরে ফিরতে পারবে। কিন্তু তারা আর কোনওদিনই ফিরতে পারেনি। কিন্তু এত বড় বিপর্যয়ের পরও চেরনোবিল পাওয়ার প্লান্ট চালু রাখা হয়েছিল। তিনটি চুল্লি চালু রাখতে কর্মীদের বসবাসের জন্য আবাসন তৈরি হয়েছিল। এই প্রয়োজন থেকেই জন্ম হয়েছিল স্লাভুটিচ শহরের। চেরনোবিল জাদুঘরের কর্মী ক্রিস্টিনা বেলচেঙ্কোর কথায়, এই শহরটি সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ স্মৃতিস্তম্ভ।

আজ প্রেপিয়াত দুনিয়ার বিখ্যাত মৃত শহর। এই শহরের প্রতিটি বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হবে বর্তমান ও অতীতের মাঝে দাঁড়িয়ে। বন্ধ দরজাগুলির ওপাশে রয়েছে শুধুই যন্ত্রণা। এ এক অদ্ভুত শহর, জীবন্মৃত স্মৃতিদের দুঃখ চেপে হাতড়ে খোঁজার শহর। তবুও এখানকার গজিয়ে ওঠা জঙ্গল, পথঘাট, পরিত্যক্ত ভবনগুলি পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। কীসের টানে? অবশ্যই বিশুদ্ধ বিপর্যয় এবং কসমিক তাণ্ডবের ডাকে। যে ডাক এবং ভয়ঙ্করের আহ্বান শুনিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিনাট্য 'নটরাজ'-এর গানে: 'ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে।' ভৈরবের রোম্যান্টিক আকর্ষণই যেন ফিরে এসেছে এ যুগের ডার্ক ট্যুরিজমের সংকটজনক বিপদগর্ভ আকর্ষে!

১৯৯৬ সালে সেই ডার্ক ট্যুরিজমের ধারণা প্রচলন করেন গ্লাসগো ক্যালেডোনিয়ান ইউনিভার্সিটির দুই ফ্যাকাল্টি সদস্য— জন লেনন ও ম্যালকম ফোলি। তাঁদের মনে হয়েছিল, পর্যটনের সঙ্গে বিপদ, ভয়, বিচিত্র আশঙ্কা, মানুষের পীড়ন, অত্যাচারের গল্প, এমনকী পর্যটকদেরও মৃত্যুর আশঙ্কা— এসব টেনশন মেশাতে পারলে পর্যটনের বাণিজ্যিক টান বাড়বে। এই ধরনের ভয়ার্ত, মৃত্যুময় পর্যটনের তাঁরা নাম দিয়েছিলেন 'ডার্ক ট্যুরিজম'। এবং সত্যিই তৈরি হল ভ্রমণের নতুন শৈলী, বেড়ানোর নতুন বাজার। কেমন সেই ট্যুরিজম?

ভাঙাচোরা কাঠের দরজা। মাকড়সার জালে ঢাকা। শ্যাওলা ধরা ইটের পাঁজা এখানে-ওখানে। ভিতরে ঢুকতেই ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল দুটো বাদুড়। আজ আমেরিকা বা ব্রিটেনের মতো দেশে এমন ভূতুড়ে বাড়ি ঘিরে পর্যটন গড়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে এগিয়ে সম্ভবত স্কটল্যান্ড। স্কটিশ রাজধানী এডিনবরায় ভূতুড়ে পর্যটনকেন্দ্রের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মেরি কিঙ্গ-এর বাড়ির গুপ্তকক্ষকে এডিনবরার সবচেয়ে ভূতুড়ে স্থান বলা হয়। ১৬৪৫ সালে বহু প্লেগ রোগীকে ওই ঘরে বন্দি করে দেওয়ালে গাঁথনি তুলে দেওয়া হয়েছিল, যাতে মহামারী না ছড়ায়। ওই রোগীদের আত্মা নাকি সেখানে এখনও ঘুরে বেড়ায়। আবার অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত স্লাইনস দুর্গের কাছে 'কিলমারনক আর্মস' নামে যে হোটেলটিতে স্টোকার প্রায়ই থাকতেন, সেটাও ভ্রমণার্থীদের কাছে আলাদা আকর্ষণ। এডিনবরা দুর্গ, ফাইভি দুর্গের মতো জায়গাও ভূতুড়ে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে জনপ্রিয়।

ইংরেজি প্রবাদে বলে, ডেড মেন টেল নো টেলস। অশরীরীরা গল্প বলে না। কিন্তু অশরীরীদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে গা শিরশির করা, হাড় হিম করা আষাঢ়ে সব গল্প। ভূত দেখার নেশাই নয়, পর্যটকদের আকর্ষণ করছে ধ্বংসের ইতিহাসও। ধ্বংসলীলা 'উপভোগ' করে শিউরে উঠতে সেইসব জায়গায় ছুটে যাচ্ছেন বহু মানুষ। নাৎসি বাহিনীর অত্যাচারের সাক্ষী পোল্যান্ডের অসউইৎজ ক্যাম্প, জাপানের আওকিগাহারা সুইসাইড ফরেস্ট, রুয়ান্ডার গণহত্যার মেমোরিয়াল, পারমাণবিক বোমায় হারিয়ে যাওয়া হিরোশিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসাবশেষ, ৯/১১ হামলার সাক্ষী গ্রাউন্ড জিরো। আর এই সবক'টি স্থানের একটি ক্ষেত্রে মিল আছে, প্রতিটি জায়গা মানুষের বেদনার সাক্ষী। ঠিক যেমন, ২৬/১১-র জঙ্গি হানায় আক্রান্ত মুম্বইয়ের লিওপোল্ড ক্যাফের দেওয়ালে গুলির দাগ দেখতে ভারতে ছুটে আসেন বহু বিদেশি। জাগ্রত আগ্নেয়গিরিকে খুব কাছ থেকে দেখানো বা মাউন্ট এভারেস্টের খুব কাছে নিয়ে যাওয়ার বিপজ্জনক ফ্লাইটও আধুনিক ডার্ক ট্যুরিজমের অঙ্গ। ভয়ঙ্কর খাদের ধারে ঝুলন্ত বাড়িতে একরাত কাটানো এমন বিপর্যয়ের রোমাঞ্চ ও নেশা টানছে অনেকেই।

খবরে প্রকাশ, কেদারনাথও নাকি হয়ে উঠবে 'অন্ধকার পর্যটন' গন্তব্য। যেভাবে ফ্রান্স, ইতালি, চেক রিপাবলিক কিংবা রাশিয়ায় জঙ্গি হামলার নিদর্শন দেখতে ছুটে যান মানুষ, সেভাবেই কেদারনাথে তুলে ধরা হবে ২০১৩ সালের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিহ্নগুলিকে। আর এরকম ভয়ঙ্কর দুনিয়াকে পিছনে রেখে সেলফি তোলায় মগ্ন হবেন কোনও পর্যটক। কী আশ্চর্য দুনিয়া ভাবুন!

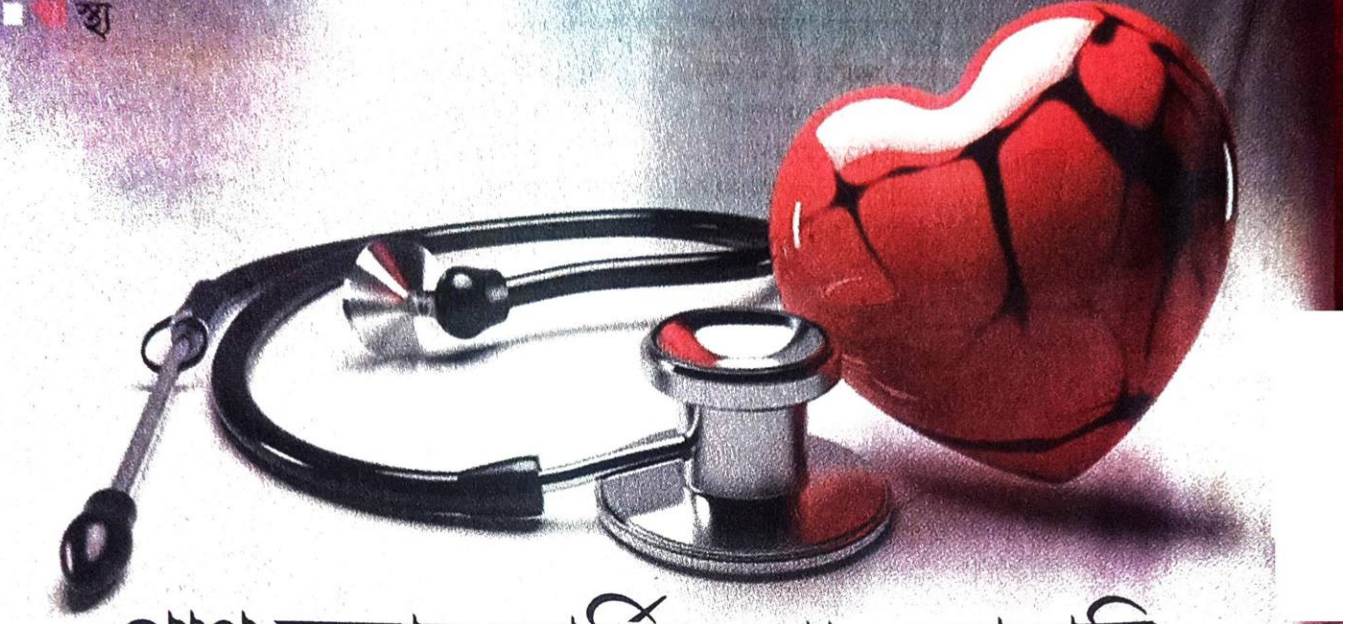

প্রাণ রক্ষায় কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন বা সিপিআর

ডাঃ নীহাররঞ্জন মণ্ডল

চিকিৎসক হওয়ার সুবাদে কাটিয়েছি সুদীর্ঘ কর্মজীবন। সরকারি হাসপাতালে কাজের সুবাদে বলতে পারি, প্রায় ২০ জন কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের রোগীকে বাঁচিয়ে তুলতে পেরেছিলাম শুধু সিপিআর দিয়ে। তবে হৃদস্পন্দন বন্ধ অবস্থায় যারা হাসপাতালে এসেছে তাদের ক্ষেত্রে আমার বা আমার সহকারীদের অভিজ্ঞতা খুবই দুঃখজনক। এদের জন্য প্রায় কিছুই করার থাকে না, মৃত ঘোষণা করা ছাড়া। কারণ যতক্ষণে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে, ততক্ষণে তাদের শ্বাসও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চোখের মণি প্রসারিত— আলো ফেললে স্থির। ঘটনার ইতিহাস জানতে গিয়ে শুনেছি, ওই সব ব্যক্তিরা বাড়িতেই মারা গিয়েছে। কয়েকজন রাস্তায়।

প্রশ্ন হল, সত্যিই কি এদের জন্য কিছুই করা যায় না? বহু ক্ষেত্রেই দেখেছি, মৃতদের মধ্যে অনেকের বয়স খুবই কম। এভাবে উৎপাদনশীল বয়সে মানব সম্পদ হারানোর ঘটনা সমাজের পক্ষেও ক্ষতিকর।

পৃথিবীতে প্রায় ৮৮ শতাংশ (ভারতে আরও বেশি) কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বা হৃদযন্ত্র বন্ধের মতো ঘটনা ঘটে হাসপাতালের বাইরে, তার মধ্যে আবার বেশিরভাগ ঘটে বাড়িতে বা বাড়ির আশপাশে। এক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোকেরাই যদি সিপিআর দিতে পারে তাতে রোগীর প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা থাকে। তবে রাস্তাঘাটে বা অপরিচিতদের মধ্যে থাকার সময় কারও কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হলে ভালো হয় পুলিস ও নিরাপত্তারক্ষীরা অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারলে। তাই চিকিৎসাকর্মী, রক্ষী, পুলিস নির্বিশেষে এই পদ্ধতি শেখা এবং যথাশীঘ্র তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা দরকার। কারণ একবার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হলে তারপর প্রতি মিনিট দেরির জন্য প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা ৭-১০ শতাংশ হারে কমে। অথচ সিপিআর দিতে দিতে ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে রোগীকে হাসপাতালে আনা যায়। প্রাণ বাঁচার সম্ভাবনা প্রায় ২৩ শতাংশ বাড়ে। আজকাল বহু সংস্থা নিজ নিজ জায়গায় সিপিআর শেখানোর ব্যবস্থাও করে। কিন্তু এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসার না হলে দুর্ভাগা মানুষগুলির মৃত্যু ঠেকানো মুশকিল।

কতকগুলি ঘটনা

৩১/৫/২০২২। বছর দেড়েক আগের ঘটনা। অনুষ্ঠান চলাকালীন বিখ্যাত গায়ক কেকে কলকাতায় নজরুল মঞ্চে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে জানা যায় আর কিছু করার নেই।

২৪/০২/২০২৪। টেবিলটেনিস খেলোয়াড় অর্পিতা নন্দী ইছাপুরে জোনাল সিটি দলকে জিতিয়ে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের কবলে পড়ে মারা যান।

দু'টি ঘটনার ক্ষেত্রেই বলা যায়, সময়মতো সিপিআর দিলে হয়তো তাঁরা দু'জনেই বেঁচে যেতেন।

উল্টোদিকে— ২০২১ সালের জুন মাসে ডেনমার্কের ফুটবল অধিনায়ক ক্রিশ্চিয়ান এরিকশন ইউরো কাপে খেলার সময় কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের শিকার হন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়ায় তিনি বেঁচে যান। ৯ মাস পর আবার খেলার জগতে ফিরে আসেন এবং ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপে তিনি খেলেছেন। এই বছরই জুলাই মাসে দিল্লি বিমানবন্দরে ডাঃ প্রিয়া গোয়েল এইভাবে একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলেন (সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল)।

এজন্যই সারা পৃথিবীব্যাপী একটা কথা চালু হয়েছে— 'বাই স্ট্যান্ডার্ড সিপিআর' বা 'প্রত্যক্ষদর্শীর হৃদশ্বাস পুনরুজ্জীবন'— যা জানা সবাইয়ের প্রয়োজন সমাজের জন্য এবং নিজেদের জন্য।

কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কেন হয়?

হঠাৎ হৃদস্পন্দন বন্ধ হওয়ার সাধারণ কারণ ভেন্ট্রিকুলার ফ্রিব্রিলেশন বা 'নিলয়-কম্পন' যা আবার সবথেকে বেশি ঘটে হার্ট অ্যাটাকের (হৃদযন্ত্রের রক্তবাহী ধমনীর মধ্যে রক্ত চলন বন্ধ হলে) বা হার্টের মধ্যকার বিদ্যুৎ প্রবাহ ব্যবস্থায় তীব্র ব্যাঘাতজনিত কারণে।

হঠাৎ কাউকে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখলে কী করবেন?

হঠাৎ কাউকে অজ্ঞান হতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে চিৎ করে শুইয়ে দিতে হবে। জায়গাটা যদি ঠিক মনে না হয় তবে নিকটতম শক্ত ও সমতল পরিষ্কার জায়গায় তাঁকে স্থানান্তরিত করুন। না হলে একজন প্রমাণ সাইজের মানুষকে শুইয়ে রাখার মতো কাঠের পাটাতন এনে তাকে শোয়াতে হবে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেই তা করতে হবে। বিষাক্ত তরল বা গ্যাস থাকলে তার থেকে তাকে দূরে নিতে হবে। সিপিআর যে দেবে আর যে নেবে— দু'জনকেই নিরাপদ জায়গায় থাকতে হবে।

রোগী সজ্ঞানে আছেন কি না তাও দেখা দরকার। প্রথমে রোগীকে ডাকুন ও দুই হাতে দুই কাঁধ দিয়ে ঝাঁকান। কোনও সাড়া না মিললে রোগীর নাকের কাছে হাতের তালুর উল্টোদিক রেখে দেখুন শ্বাস পড়ছে কি না। না বুঝতে পারলে বুক-পেটের ওঠা-নামা লক্ষ করুন। তাতে বোঝা যাবে শ্বাসক্রিয়া চলছে কি না। দেখুন নাড়ি চলছে কি না। বুড়ো আঙুলের দিকে তালুর তলে কব্জির উপর মাঝের তিনটি আঙুলের ডগার সাহায্য নাড়ি সহজেই অনুভব করা যায়। না পেলে গলার কণ্ঠনালী ও পার্শ্বস্থ পেশির মধ্যে একইভাবে ক্যারোটিড আর্টারিতে আঙুল চেপে (যা আরও বড় ধমনী) নাড়ি বোঝা যায়। তাতেও না বোঝা গেলে বুকে কান রেখে বুকের ধুকপুক শুনতে পারেন।

অনেক রোগী অজ্ঞান থাকেন। তবে শ্বাস ও নাড়ি চলতে থাকে। এক্ষেত্রে রোগীকে পাশ ফিরিয়ে মাথা পিছনদিকে বেঁকিয়ে (রিকভারি পজিশন) হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। মাথার পিছনদিক বেঁকিয়ে রাখলে শ্বাসনালী বন্ধ হয় না, হাওয়া সহজে ঢুকতে ও বের হতে পারে। শ্বাস ও নাড়ি বন্ধ হলে (প্রথমে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হলে কয়েক মিনিটের মধ্যে হৃদক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়। আবার প্রথমে হৃদক্রিয়া বন্ধ হলে কয়েক মিনিটের মধ্যে শ্বাসক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়) ভয় না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের লোকজনকে ডাকতে হবে। ১০২ বা ১১২ নাম্বারে (কিছু রাজ্যে ১০৮) ফোন করে নিশ্চয়যান (অ্যাম্বুলেন্স) বা যে কোনও গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে যত শীঘ্র সম্ভব। রোগী থাকবে চিৎ (সুপাইন) অবস্থায় মাথা পিছনদিক বাঁকানো (বালিশ দেওয়া কোনও মতেই চলবে না)। এক হাতের কব্জির উপর অন্য হাতের কব্জি রেখে বুকের সামনে মাঝ বরাবর চ্যাপ্টা হাড়ের (বক্ষফলক) নিম্নার্ধের মাঝখানে নীচের দিকে চাপ দিতে হবে। রোগীর বুকের যে কোনও পাশে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে। এই চ্যাপ্টা হাড় বক্ষফলক বা স্টারনামের পিছনেই থাকে হৃৎপিণ্ড। স্টারনামের সঙ্গে দু'টি বুকের সংযোগকারী সরলরেখা যে স্থানে মিলেছে সেই জায়গাও এভাবে ঠিক করে নেওয়া যায়। এই বক্ষফলককে নামাতে হবে ২ ইঞ্চি। সমান তালে দিতে হবে ১ মিনিটে ১০০ বার। কোনও বিরতি দেওয়া চলবে না। ক্লান্ত হলে পাশের কাউকে তা চালিয়ে যেতে হবে। ২-৩ মিনিট বাদে বাদে দেখতে হবে নাড়ি ফিরল কি না। এইভাবে বুকে চাপ দিতে দিতে রোগীকে গাড়িতে তুলতে হবে। সেখানেও সিপিআর দিতে দিতে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ৩০ মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচার সম্ভাবনা অনেকটাই বজায় থাকে।

সরাসরি লম্বাভাবে বুকে চাপ দিতে হবে। কোমর থেকে শরীরের সঞ্চালন হবে দুই হাতের মাধ্যমে। অর্থাৎ কব্জি, কনুই, কাঁধ ও মেরুদণ্ডের সব অস্থিসন্ধি থাকবে বদ্ধ অবস্থায়। ব্যাপারটা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ঢেঁকির ওঠাপড়ার মাধ্যমে। সিপিআর প্রদানকারীর কাঁধ থাকবে রোগীর ঠিক বুকের উপর; যা তুলনা করা যায় ঢেঁকির পেষক দণ্ড ঢেঁকির দেহের যে জায়গায় মিলেছে। দুই বাহুকে তুলনা করা যেতে পারে পেষক দণ্ডের সঙ্গে, কোমর হবে ঢেঁকির আলম্ব ও মেরুদণ্ড সহ দেহকে তুলনা করা যায় ঢেঁকির লম্বা প্রধান অংশের সঙ্গে। এইভাবে বুকে চাপ দেওয়ার ফলে হৃদযন্ত্র বক্ষফলক ও মেরুদণ্ডের মধ্যে চাপ যাবে ও কৃত্রিম হৃদ সংকোচনের ফলে হৃদয়স্থিত রক্ত ধমনীবাহিত হয়ে মস্তিষ্ক, ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের নিজস্ব পেশিতে পৌঁছবে। আবার ২ ইঞ্চি বা বুকের উচ্চতায় ⅙ অংশ চাপ পড়ার ফলে কৃত্রিম হৃদপ্রসারণ হয় এবং শিরার মাধ্যমে হৃদয়ে আবার রক্ত ভরবে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে লম্বভাবে, ২ ইঞ্চির কম চাপ দিলে তা যথেষ্ট রক্তকে মস্তিষ্ক পাঠাতে পারবে না। মিনিটে ১০০ বার চাপ দিলে একটু সময় পাওয়া যায় বুকের চাপ মুক্তির জন্য। এর থেকে বেশি হলে চাপমুক্তির পরিমাণ কম হতে পারে। মিনিটে ১০০ বারের থেকে বেশি কম হলে হার্টের স্বাভাবিক ছন্দ আসতে দেরি হতে পারে। বক্ষফলকের উপরে ২ ইঞ্চি চাপ দিলে পাঁজরের হাড় ভাঙার সম্ভাবনা থাকে না।

মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস দেওয়াতে সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা দ্বিধা কাজ করে। করোনা পরবর্তী সময়ে তা আরও বেড়েছে। ভালোভাবে দেখলে বোঝা যায় বুকে চাপ দিলে হৃদযন্ত্রে সঙ্গে

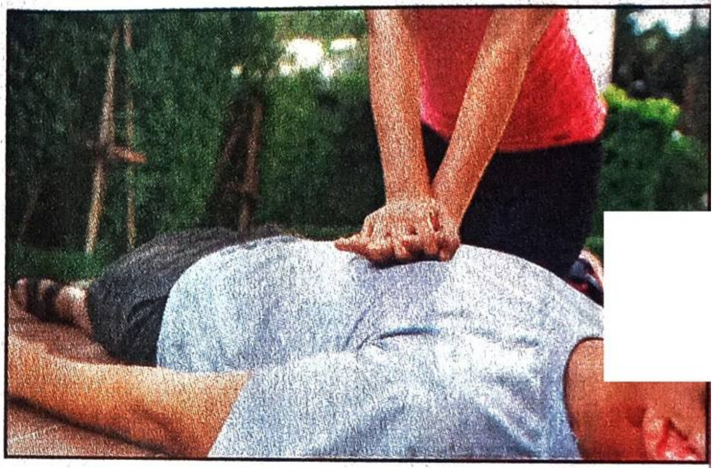

সঙ্গে দুই ফুসফুসেও চাপ যায় ও তার হাওয়া শ্বাসনালী মাধ্যমে বাইরে যায় আবার চাপ ছাড়লে বাইরের হাওয়া ফুসফুসে চলে আসে। তাই অধুনা সিপিআর-কে বলা যায় সিসি ও সিপিআর কার্ডিয়াক কম্প্রেশন অনলি সিপিআর বা হৃদচাপের দ্বারাই হৃদশ্বাস পুনরুজ্জীবন বা কম্প্রেশান অনলি লাইফ সাপোর্ট। বাংলায় হৃদচাপের দ্বারাই পুনরুজ্জীবন বা হৃদপুনরুজ্জীবন।

আরও উপযুক্ত 'শীর্ষক' হবে বাই স্ট্যান্ডার্ড সিসি ও সিপিআর বা 'প্রত্যক্ষদর্শীর হৃদশ্বাস পুনরুজ্জীবন।'

এইভাবে বুকে চাপ দিতে দিতে হঠাৎ রোগীর জ্ঞান ফিরতে পারে— আবার কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে আবার সাড়া দিতে পারে, তবুও সিপিআর চালু রেখে তাকে হাসপাতালে ডাক্তারবাবুদের হাতে পৌঁছে দিতে হবে। হৃদযন্ত্রের কাজ বন্ধ হলে এভাবে কৃত্রিম পদ্ধতিতে হৃদযন্ত্রে সংকোচন (সিস্টোল) ও প্রসারণ (ডায়াস্টোল) বজায় রেখে মস্তিষ্ককে বাঁচিয়ে রাখার পদ্ধতিই হল হৃদশ্বাস পুনরুজ্জীবন। মনে রাখবেন, বহু হাসপাতালে নিখরচায় সিপিআর ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করে। অবশ্যই শিখুন সিপিআর পদ্ধতি।

• লেখক কুলপি গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক

খেতাব জিতে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু সিন্ধুর

২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে জোড়া সুখবর! গত রবিবার ২৮ মাসের খরা কাটিয়ে সৈয়দ মোদির শিরোপা জিতেছেন পিভি সিন্ধু। আর ঠিক তার পরের দিনেই প্রকাশ্যে এল বিয়ের খবর। চলতি মাসের ২২ তারিখ নতুন জীবন শুরু করতে চলেছেন ওলিম্পিকসে জোড়া পদকজয়ী তারকা। পাত্র এক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার শীর্ষকর্তা। নাম বেঙ্কট সাই দত্ত।

২০০৯ সালে পেশাদার ব্যাডমিন্টনে পথচলা শুরু সিন্ধুর। তখন দেশের এক নম্বর শাটলার সাইনা নেহওয়াল। দু'জনেই হায়দরাবাদি। তবে অল্প সময়েই নজর কাড়তে ভুল হয়নি সিন্ধুর। এই পর্বে সাইনার সঙ্গে তাঁর হাড্ডাহাড্ডি প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। তবে ২০১৬ রিও এবং ২০২০ টোকিও পরপর ওলিম্পিকসে দেশকে পদক এনে দেন সিন্ধু। রুপোর পর ব্রোঞ্জ জেতেন তিনি। আর আগেই অবশ্য সাইনা নেহওয়ালকে সিংহাসনচ্যুত করে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে সেরার তকমা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এবার ছিল সেই জায়গা ধরে রাখার লড়াই। ২০২২ সাল পর্যন্ত টপ ফর্মে লড়েছেন তিনি। এই পর্বে কমনওয়েলথ গেমস ও এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপাও জেতেন। ২০২২ সালেই শেষবার ইন্দোনেশিয়া ওপেন জিতেছিলেন সিন্ধু। কিন্তু এরপরই বড় বাদ সাধল চোট। দীর্ঘদিন কোর্টের বাইরে চলে যান তিনি।

অল্প বয়সে সাফল্য এলেও লড়াই ছিল তাঁর কেরিয়ারের প্রধান হাতিয়ার। হারার আগে হার মানা স্বভাবে নেই তাঁর। তাই চোট সারিয়ে ২০২৩ সালে মালয়েশিয়া ওপেনে কোর্টে ফেরেন তিনি। সেবার অবশ্য দাগ কাটতে ব্যর্থ তারকা শাটলার। তবে পরের প্রতিযোগিতা, এশিয়া মিক্সড ইভেন্টে ভারতীয় দলের ব্রোঞ্জ জয়ে বড় অবদান রাখেন তিনি। কিন্তু চোটে জর্জরিত সিন্ধু ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে ব্যর্থ। চোটগ্রস্ত শাটলারকে ফিরতে হয়েছিল রিহ্যাবে। দীর্ঘ সময় কোর্টের বাইরে থাকার মধ্যেই বেজে যায় প্যারিস ওলিম্পিকসের ঘণ্টা। ওলিম্পিকসে তৃতীয় পদকের আশায় জোরকদমে প্রস্তুতিও শুরু করেন তিনি। কিন্তু 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এ পদকের হ্যাটট্রিকে ব্যর্থ। প্যারিসে মহিলা সিঙ্গলসে শেষ ষোলোয় লড়াই থামে তাঁর। তবুও মুষড়ে পড়েননি তিনি। বরং কোচ বদলে মহড়া শুরু করেন সিন্ধু। দু'টি প্রতিযোগিতায় তার কোনও ছাপ না পড়লেও অধরা সাফল্য এল সৈয়দ মোদি টুর্নামেন্টে। সেই সঙ্গে তৃতীয়বার এই শিরোপা ঘরে তুললেন তিনি।

২৯ বছরের শাটলারকে নিয়ে এর মাঝে সমালোচনা কম হয়নি। অনেকে তো তাঁর অবসরের দাবিও তুলে ফেলেছিলেন। উল্টে ফিটনেসের উপরই জোর দেন তিনি। লখনউয়ে তার ছাপই ধরা পড়েছে কোর্টে। দুরন্ত প্রত্যাবর্তনের পর তাই সিন্ধুর অবসর নিয়ে গুঞ্জনও কর্পূরের মতো উবে গিয়েছে। বলাই বাহুল্য, খেতাবের খরা কাটায় নতুন বছরে নতুন উদ্যমে ধরা দেবেন সিন্ধু।

এদিকে, ২২ ডিসেম্বর সিন্ধুর বিয়ের আসর বসছে উদয়পুরে। জাঁকজমকের কোনও খামতি থাকবে না সেখানে। আমন্ত্রিতদের তালিকায় ভিভিআইপিদের লম্বা লাইন। ২৪ ডিসেম্বর রিসেপশনেও থাকবে এলাহি ব্যাপার। সেটা অবশ্য হবে হায়দরাবাদে। ২০ তারিখ থেকেই শুরু হয়ে যাবে অনুষ্ঠান। সঙ্গীত, মেহেন্দি আরও কত কী! পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সিন্ধু ও বেঙ্কট সাই দত্তের পরিচয় দীর্ঘদিনের। তাঁদের চার হাত এক হওয়ার খবর পেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নেটিজেনরা।

• **অম্বরীশ চট্টোপাধ্যায়**

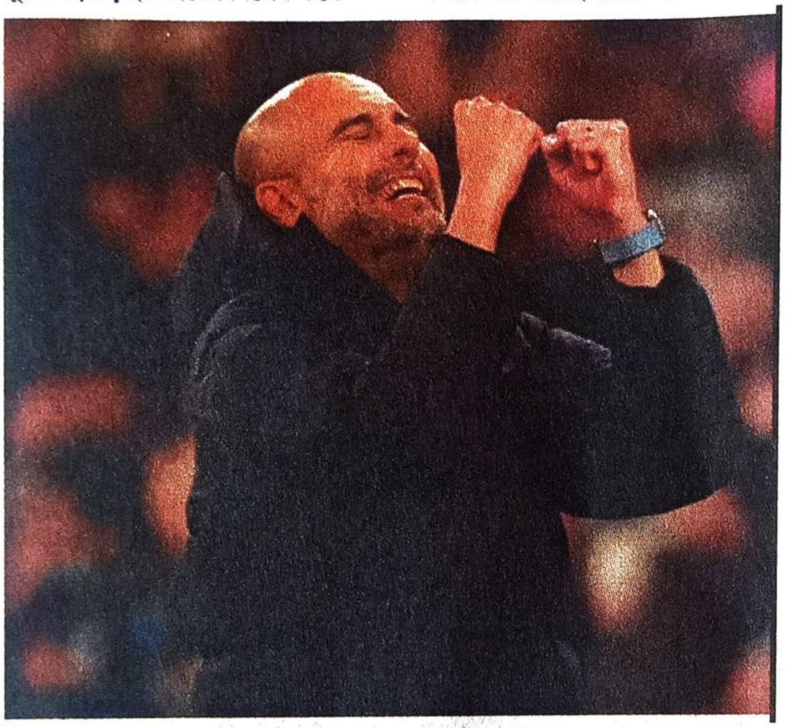

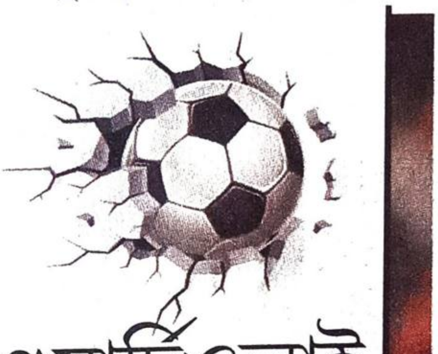

গুয়ার্দিওলাই হলেন ফুটবলের চে গেভারা

সালটা ২০১৮। আন্তর্জাতিক বিরতিতে ছুটি পেতেই আর্জেন্তিনায় পাড়ি দেন পেপ গুয়ার্দিওলা। ডিয়েগো মারাদোনার দেশে পা রেখেই পৌঁছে যান ১৯৭৮ বিশ্বকাপ জয়ী কোচ সিজার লুইস মেনোত্তির কাছে। সেদিনের ঘণ্টা তিনেকের আলোচনায় গুরুকে নিংড়ে নিয়েছিলেন পেপ। তবে তাঁর ফুটবল কেরিয়ারের পুরোটা জুড়ে শুধুই টোটাল ফুটবল। তাঁর আদর্শ জোহান ক্রুয়েফের দেখানো পথ ধরেই বার্সেলোনাকে সাফল্য এনে দিয়েছিলেন এই স্প্যানিশ কোচ। তাঁর হাত ধরেই টোটাল ফুটবলের আধুনিক নাম হয় তিকি-তাকা। কিন্তু ইংলিশ ফুটবলে পা রেখেই একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। বিশেষ করে ইংল্যান্ডের প্রতিটি ক্লাবের হার না মানা মানসিকতা অনেকটাই কাজ কঠিন করে তোলে সিটি কোচের। আর তা অতিক্রম করতেই মেনোত্তির দ্বারস্থ হন তিনি। সেদিনের সেই দীর্ঘ কথোপকথনে পেপ কতটা সমৃদ্ধ হয়েছিলেন, তা পরের কয়েক বছরে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতে পরিসংখ্যানই স্পষ্ট। নিজের ফুটবল তত্ত্ব থেকে না সরেও কীভাবে নতুন সিস্টেমের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়, তা হাতেনাতে করে দেখিয়েছিলেন পেপ। ইংল্যান্ডের হাই-প্রেসিং ফুটবলের সঙ্গে পাসিং ফুটবলের এক দারুণ মেলবন্ধন ঘটান তিনি। গুয়ার্দিওলার এই লড়াকু মানসিকতা ও ফুটবলকে বদলে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে সম্মান জানিয়ে পরবর্তী সময়ে তাঁকে চে গেভারার সঙ্গে তুলনা করেন মেনোত্তি। আসলে বার্সেলোনার দায়িত্ব ছাড়ার পর পেপকে সামনে রেখে কাতালুনিয়ানরা স্বাধীন রাষ্ট্রের লড়াই লড়তে চেয়েছিলেন। অনেকেই ভেবেছিলেন, হয়তো রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবেই ফের বার্সায় প্রত্যাবর্তন করবেন তিনি। তবে মাঠের বাইরে না হলেও, পেপ সবসময় তাঁর ফুটবল দর্শনের মধ্য দিয়ে বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছেন। এই মানসিকতাই এই প্রজন্মের বাকি কোচেদের থেকে তাঁকে আলাদা করে তুলেছে।

২০১৮ থেকে ২০২৪, কেটে গিয়েছে ছ'বছর। এই পর্বে বৈপ্লবিক ফুটবল দর্শনে ভর করেই ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে একের পর এক সাফল্য এনে দিয়েছেন পেপ। তাঁর হাত ধরেই ক্লাব ইতিহাসে প্রথম উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বাদ পান সিটিজেনরা। কেরিয়ারে দ্বিতীয়বারের জন্য ত্রিমুকুটের কৃতিত্ব অর্জন করেন পেপ। তছনছ করে দেন প্রিমিয়ার লিগের যাবতীয় রেকর্ড। তবে সাফল্যের পথে কাঁটা বিছানো থাকবে না, তা আবার হয় নাকি! চলতি মরশুমে হঠাৎই ম্যান সিটির পারফরম্যান্সের গ্রাফ এক ধাক্কায় অনেকটাই পতন ঘটেছে। কেরিয়ারে প্রথমবার টানা পাঁচ ম্যাচে হারের স্বাদ পান পেপ। জয় অধরা সাত ম্যাচে। এমন পরিস্থিতিতে অন্য কেউ থাকলে বরখাস্তের চিঠি হাতে পেয়ে যেতেন। তবে পেপ যে অন্য ধাতুর তৈরি। কঠিন সময়ে সব ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াটা তাঁর রক্তে নেই। বরং ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা দিয়ে মাঠের সমস্যা সমাধানে নতুন পথ খুঁজে থাকেন তিনি।

২০০৮ সালের পর এই প্রথম প্রিমিয়ার লিগে টানা চার ম্যাচে হারের মুখ দেখে সিটি। অন্য কোনও কোচ হলে ফুটবলারদের চোটাঘাতকে অজুহাত হিসেবে তুলে ধরতেন। তবে পেপ সেই পথে হাঁটেননি। বরং কোনওরকম লুকোচুরি না করেই সাফ জানিয়ে দেন, 'সত্যি বলতে, আমি নিজেও জানি না কোথায় সমস্যা হচ্ছে। তবে এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। আমাদের বিশ্বাস হারালে চলবে না। জানি এই মুহূর্তে সহজ কাজও কঠিনতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আমি পালিয়ে যাওয়ার পক্ষে নই। সুযোগ চেয়েছি। তবে যখন মনে হবে আর আমাকে দিয়ে হবে না, তখন নিজেই সরে দাঁড়াব।'

অতীতের মতো এবারও পেপ তাঁর লড়াইয়ে সফল। টানা সাত ম্যাচের পয়েন্ট নষ্টের ধাক্কা কাটিয়ে অবশেষে জয়ের সরণিতে ফেরে ম্যান সিটি। লিভারপুলের বিপক্ষে হারের পর ঘুরে দাঁড়ানোর কথা বলেছিলেন সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। বড় জয়ে সেই কথাই রাখলেন তিনি। একইসঙ্গে আবারও প্রমাণ করলেন, লড়াই তাঁর রক্তে। তিনি যে আসলেই ফুটবলের চে গেভারা।

• **সঞ্জয় সরকার**

মালশ্রীর নৃত্যসন্ধ্যা

সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত হল মালশ্রী-র বার্ষিক অনুষ্ঠান। ওড়িশি নৃত্যশিল্পী ডঃ অর্পিতা ভেঙ্কটেশের নির্দেশনায় জগন্নাথ স্তুতি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। দেবী সরস্বতীর বন্দনা পরিবেশন করেন সংস্থার ছাত্রছাত্রীরা। পদ্মবিভূষণ কেলুচরণ মহাপাত্রের নৃত্য রচনা অনুসরণ করে বসন্ত পল্লবীও মঞ্চস্থ হয়। অর্পিতা ভেঙ্কটেশ তাঁর সাবলীল নৃত্যশৈলী দিয়ে 'অভিনয়'-এর মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করেন।

দ্বিতীয়ার্ধে কত্থক নৃত্যানুষ্ঠান শুরু হয় গুরু বন্দনার সঙ্গে কৃষ্ণ স্তুতি দিয়ে। একই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা ঝাঁপতাল ও শিব স্তুতি অঙ্গিকম ভুবনম পরিবেশন করেন। সম্পিতা চ্যাটার্জির একক কত্থক নৃত্য অভিনয় 'খণ্ডিত নায়িকা' নজর কাড়ে। নৃত্যনাট্য 'সবুজের দেশ'-নিবেদন করে অনুষ্ঠান শেষ হয়। নৃত্যনাট্য পরিকল্পনায় অর্পিতা ভেঙ্কটেশ ও সম্পিতা চ্যাটার্জি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলাবতী দেবী ও পলি গুহ। অতিথি হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী হৈমন্তী শুক্লা।

কবি ও কাব্যে রামায়ণ

সম্প্রতি গৌড়ীয় নৃত্য ভারতীর আয়োজনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২০০তম জন্মজয়ন্তী এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন হল। এই উপলক্ষ্যে 'দ্য রামায়ণ র‍্যাপসোডি' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মধুসূদন মঞ্চে। অনুষ্ঠানে রামায়ণের দুটি নির্বাচিত অংশ নৃত্যনাট্যে পরিবেশিত হল।

প্রথমার্ধে বিভিন্ন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুপ্রেরণায় এবং বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য গৌড়ীয় নৃত্য এবং বিভিন্ন লৌকিক নৃত্যের আঙ্গিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালমৃগয়া' মঞ্চায়িত হয়। নৃত্যনাট্যটির সহযোগী সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন অয়ন মুখোপাধ্যায়, নৃত্য পরিচালনায় ডঃ শতাব্দী আচার্য। মূল ভাবনা, সঙ্গীত ও সমগ্র পরিচালনায় শুভদীপ চক্রবর্তী। পরিবেশনায় ছিল মিত্রায়ন, বিক্রমশিলা এবং গৌড়ীয় নৃত্য ভারতের শিল্পীবৃন্দ। মঞ্চসজ্জা, আলোকবিন্যাস, নৃত্যনির্মিতি এবং সর্বোপরি উপস্থাপনা নৃত্যনাট্যটিকে দর্শকদের মনোগ্রাহী করে তোলে।

কবি মধুসূদন দত্তের ২০০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে গৌড়ীয় নৃত্য ভারতীর পরিবেশনায় ছিল মেঘনাদবধ কাব্য। ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় এই নৃত্যনাট্যটি প্রশংসার দাবি রাখে। আধুনিকতার মোড়কে পৌরাণিক ভাবধারার এক মূর্তিমান আলেখ্য। সময়ের সঙ্গে ছন্দের তালে তালে যা

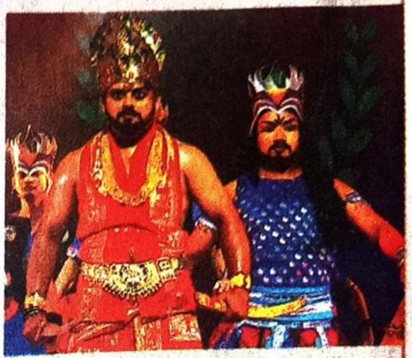

প্রতিনিয়ত তার ক্রমবর্ধমান গতির দিকে এগিয়েছে। চিত্রনাট্যের জমাট বুনন, সুদক্ষ পরিচালকের শৈল্পিক ছোঁয়া, কুশীলবদের নৃত্যশৈলী, অভিনয় পারদর্শিতা, মঞ্চ বিন্যাস দর্শকদের আবিষ্ট করে রাখে। পণ্ডিত অমিতাভ মুখার্জির সুরারোপিত নিজ কণ্ঠে গাওয়া গানগুলি গোটা বিষয়টাকে গাম্ভীর্য জুগিয়েছে। রাবণের ভূমিকায় অয়ন মুখার্জি ও মেঘনাদের ভূমিকায় ডঃ সৌম্য ভৌমিকের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

১৫-র আলোয় ধ্রুব

সম্প্রতি ধ্রুব ইনস্টিটিউট অব ডান্স ফাউন্ডেশনের বার্ষিক অনুষ্ঠান হল জ্ঞান মঞ্চ ও আইসিসিআরে। জ্ঞান মঞ্চে সন্ধ্যা শুরু হয় ভরতনাট্যম নৃত্যে। দ্বিতীয়ার্ধে 'নটরাজ ঋতু রঙ্গশালা' শীর্ষক সাম্প্রতিক প্রযোজনা পরিবেশিত হয়। এটি ছিল ধ্রুব ইনস্টিটিউট অব ডান্স ফাউন্ডেশন এবং রবি স্পন্দনের যৌথ উদ্যোগ। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন ডঃ দূর্বা সিংহ রায়চৌধুরী। নৃত্য পরিচালনায় সায়নী চক্রবর্তী ও তাঁর দল।

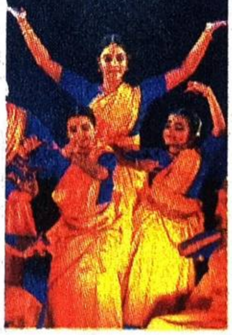

দ্বিতীয় সন্ধ্যার নাম ছিল 'সুবর্ণ: লাইনস অন গোল্ড'। এটি আইসিসিআরে অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ হিমাংশু শ্রীবাস্তবের শিল্প প্রদর্শনী দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরবর্তী পর্বে বিভিন্ন নৃত্যশৈলী পরিবেশন করে সংস্থার শিক্ষার্থীরা। দীধিতা, শ্রদ্ধাশ্রী, সঙ্গীতা, ময়ূরী এবং অতসীর নিবেদনে 'বর্ষা' প্রকৃতির হারিয়ে যাওয়ার সৌন্দর্যকে চিত্রিত করেছিল। এর পরে রাজদীপ ব্যানার্জি, মৌমিতা গুপ্তা এবং শ্রেয়া প্রামাণিকের তত্ত্বাবধানে দুই উদীয়মান ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পী মহাদেব শিব শম্ভো ও একজন থিল্লানা পরিবেশন করেন। এরপরে সম্রাট দত্তের ছাত্র শান্তনু রায় থিল্লানা মঞ্চস্থ করেন। ওড়িশি নৃত্যশিল্পী মনামী নন্দী শিব-পার্বতী উপস্থাপন করেন। সবশেষে ধ্রুব ইনস্টিটিউট অব ডান্সের প্রতিষ্ঠাতা সায়নী চক্রবর্তী নিবেদন করেন 'এ জার্নি টুয়ার্ডস দ্য মিস্টিক আই' শীর্ষক নিবেদনটি।

ব্রতী-র অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে

সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে অপালা বসু সেনের নির্দেশনায় ব্রতী-র অনুষ্ঠান 'গন্ধ-বেদনে' অনুষ্ঠিত হল। এক বিস্ময়কর ছন্দে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আবর্তিত। কোথাও এতটুকু ছন্দপতন নেই। দিন-রাত্রি, আলো-আঁধার, জীবন-মৃত্যুর বৈপরীত্যে এ ছন্দ চিরতরে বাঁধা। রবীন্দ্রনাথের যেসব গানে এই ছন্দ-মাধুর্য ধরা দেয় তার কিছু সংকলন নিয়েই প্রথমার্ধের অনুষ্ঠান 'নৃত্যরসে' সাজানো হয়। সমবেত গানগুলির মধ্যে 'বিশ্ববীণা রবে', 'নৃত্যের তালে তালে', 'উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে', 'মম চিত্তে' উল্লেখযোগ্য।

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিতত্ত্বের মূল সূক্ষ্ম উপাদান হল পঞ্চভূত— ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। আর তা পঞ্চতন্মাত্র-এর সমাহার। অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ যা আবার আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। রবীন্দ্রনাথ পঞ্চভূত নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় নানাবিধ রচনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানে তার মধ্যে থেকে গন্ধকে বেছে নেওয়া হয়। এই অপার্থিব অলৌকিক ঘ্রাণকে অনুভব করা রবীন্দ্রগানে, নৃত্যে ও গল্পে। দ্বিতীয়ার্ধের অনুষ্ঠান 'গন্ধবেদনে' সুবাসিত করে তোলে প্রেক্ষাগৃহ। ঐতিহ্য রায়ের কণ্ঠে 'বাজে করুণ সুরে' ও রোদসী ঘোষের কণ্ঠে 'বেদনা কী ভাষায় রে' এককথায় অনবদ্য। এছাড়াও ইমন হালদার, দীপাঞ্জন পাল, প্রলিপ্ত ঘোষ, প্রিয়াঙ্গী লাহিড়ী, দূর্বা সিংহ রায়চৌধুরীর কণ্ঠে যথাক্রমে 'আজি গোধূলি লগনে', 'মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম', 'মনে কী দ্বিধা', 'আজি এই গন্ধবিধুর', 'একলা বসে বাদল শেষে' গানগুলি প্রশংসনীয়। নৃত্যশিল্পীদের পরিবেশনা সন্ধ্যাটিকে আরও মনোজ্ঞ করে তোলে। প্রাককথনে ছিলেন মধুমিতা বসু। সুকুমার ঘোষ, মধুমিতা বসু, রিনি বিশ্বাস এবং কৃত্তিক ঘোষের আবৃত্তি ও ভাষ্যপাঠ পূর্ণতা দেয়। অপালা বসু সেনের ভাবনায় এমন একটি সন্ধ্যার রেশ বহুক্ষণ থেকে যায়।

বিদিশা ঘোষ

বাংলার নবজাগরণ ১৪৩১

বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল আয়োজিত 'বাংলার নবজাগরণ ১৪৩১'-এ সম্প্রতি কিছু অনন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকলেন দর্শক। করুণাময়ী সেন্ট্রাল পার্কে পাঁচদিন ব্যাপী আয়োজনে নানা বয়সের মানুষ উপভোগ করেন। 'চন্দ্রবিন্দু'র গানে প্রথম দিন ভরে ছিল মেলার মাঠ। দিন কয়েক আগেই মুক্তি পেয়েছে তাঁদের নতুন অ্যালবাম 'টালোবাসা'। তা থেকে কয়েকটি গান শুনিয়েছেন শিল্পীরা। সঙ্গে ছিল তাঁদেরই বেশ কিছু জনপ্রিয় গান। দ্বিতীয় দিন পারফর্ম করেন সায়নী পণ্ডিত। রাগাশ্রয়ী হোক বা আধুনিক— সব ধরনের গানেই সায়নীর গায়কী অসাধারণ। তৃতীয় দিন মাঠের দখল নেয় 'ফসিলস'। রূপম ইসলামের অনুষ্ঠান দেখার ভিড় সামলাতে পুলিস অগ্রণী ভূমিকা নেয়। রূপমের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ হন উপস্থিত শ্রোতারা। নতুন প্রজন্ম যে ব্যবসায় আগ্রহী, এই আয়োজন তার প্রমাণ। সেই উদ্যোগের সঙ্গে

মিলেমিশে গিয়েছিল বাংলার সংস্কৃতি।

নিজস্ব প্রতিনিধি

তানসেনের রবাব ও সুররবাব-এর ঝংকার

সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার আয়োজন করেছিল তানসেনি রবাব, বাংলার প্রাচীন সুররবাব ও সরোদের সঙ্গীতানুষ্ঠান। পরিবেশন করেন সরোদবাদক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। শাহজাহানপুর ঘরানার এই শিল্পী পণ্ডিত রাধিকামোহন মৈত্রের পরম্পরায় চার বছর বয়স থেকে তালিম নিয়েছেন প্রয়াত পণ্ডিত প্রণবকুমার নাহার কাছে। পাশাপাশি বিগত দশ বছরের উপর জয়দীপ কাজ করে যাচ্ছেন হারিয়ে যাওয়া যন্ত্রের পুনরুজ্জীবনে। মোহনবীণা, সুরশৃঙ্গারের পরে এই বছরের মাঝামাঝি তানসেনি রবাব ও সুররবাবের পুনঃপ্রচলন করেছেন। সেদিন জয়দীপ অনুষ্ঠানে সুররবাবে বিরল রাগ ছায়াবেহাগে আলাপ-জোড়-ঝালা বাজান। এরপর তিনি বিলম্বিত তিনতালে গৎ ধরেন সরোদে, বহুল প্রচলিত রাগ বেহাগে। সরোদবাদন শেষ হয় তীব্রগতির ঝালা ও রবীন্দ্রসঙ্গীত-ভাঙা বন্দিশ দিয়ে। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে জয়দীপবাবু তানসেনের রবাবে ধরেন রাগ দরবারি কানাড়া।

সংক্ষিপ্ত আলাপের পরে ধ্রুপদীয় তাল চৌতালে গৎ ধরেন। তারপর দ্রুত তিনতালে তানকারি বাজিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন। দেড় ঘণ্টার এই যন্ত্র সমারোহ অনুষ্ঠানে যোগ্য সঙ্গত করেন তবলিয়া বিভাস সাংহাই।

নিজস্ব প্রতিনিধি

রাজ কাপুর

রাজ কাপুর। বলিউডের প্রথম 'শোম্যান'। ১৪ ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিন। জন্মশতবর্ষে এই প্রখ্যাত অভিনেতা-পরিচালককে শ্রদ্ধা জানালেন তাঁর একসময়ের সহকারী।

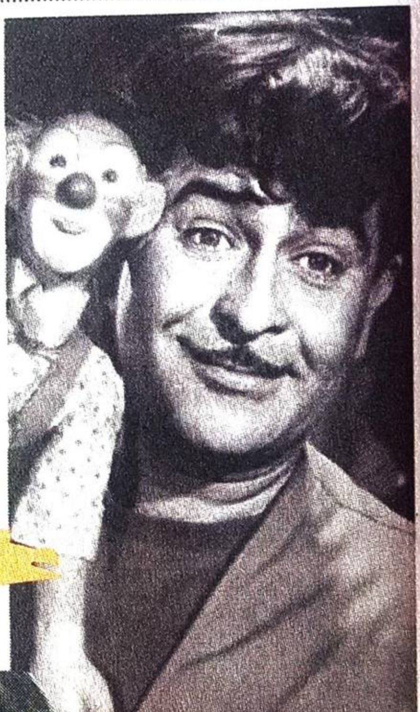

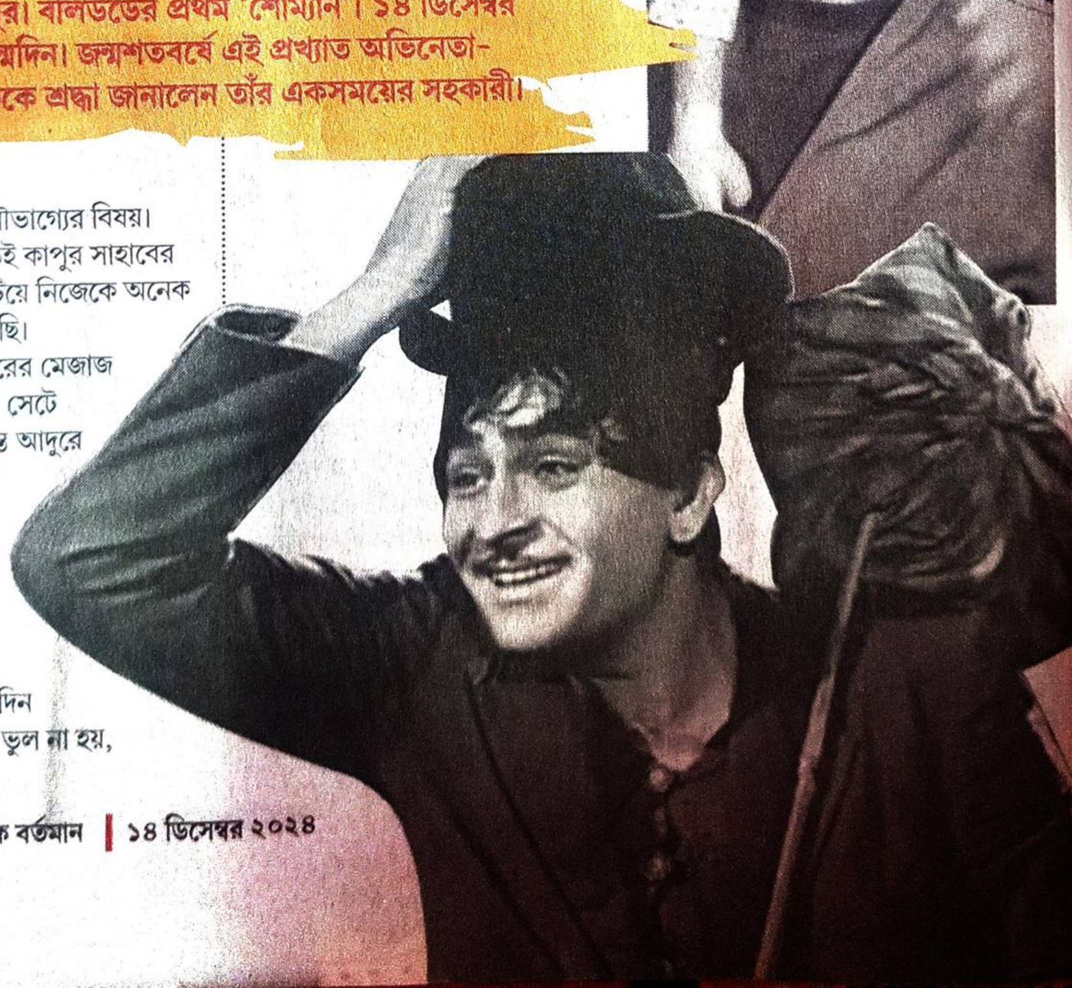

সেটে কাপুর সাহাবের মেজাজ মুহূর্তে বদলে যেত

আনিস বাজমি
(পরিচালক)

আমার বয়স তখন বছর কুড়ি। 'প্রেম রোগ' ছবির সেটে প্রথম রাজ কাপুরকে দেখি। এই ছবিতে ওঁর সহ-পরিচালক ছিলাম। আজ আমি যা কিছু, তা ওঁর কাছ থেকেই শিখেছি। কাপুর সাহাবের পাশে দাঁড়িয়ে চুপ করে শুধু ওঁকে লক্ষ করতাম। সত্যি বলতে এটা আমার কাছে এক স্বপ্নের মতো ছিল। প্রায় চার বছর ওঁর সঙ্গে কাজ করেছি। আর প্রতিদিনই মনে হতো যেন একটা নতুন স্বপ্ন দেখছি। এই স্বপ্নের যেন কোনও অন্ত নেই। ওঁর মতো মহান চিত্র নির্মাতার সঙ্গে কাজ করা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। কেরিয়ারের শুরুতেই কাপুর সাহাবের সঙ্গে চার বছর কাটিয়ে নিজেকে অনেক সমৃদ্ধ করতে পেরেছি।

সেটে রাজ কাপুরের মেজাজ মুহূর্তে বদলে যেত। সেটে কখনও উনি অত্যন্ত আদুরে এক মানুষ। আবার কখনও রাগে ফেটে পড়তেন। আর যখন রেগে যেতেন, তখন আমরা ভয়ে কাঁপতাম। আর সেদিন যাতে কোনওরকম ভুল না হয়, সে ব্যাপারে আমরা সতর্ক থাকতাম। আসলে ফিল্ম মেকিং ঘিরে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ছিলেন কাপুর সাহাব। আর ছিলেন অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। তাই শ্যুটিংয়ে একটু এদিক থেকে ওদিক হলেই উনি রেগে যেতেন। কোনও দৃশ্য নিজের মনের মতো না হওয়া পর্যন্ত উনি ছাড়তেন না। 'প্রেম রোগ'-এর শ্যুটিংয়ের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত আমি ওঁকে ভয়ই পেয়ে গিয়েছি। একটি ছবি তৈরি নিয়ে ওঁর মধ্যে যে প্যাশন লক্ষ করেছি, তা কিন্তু আর কারও মধ্যে কখনও দেখিনি। বিশেষ করে গানের ক্ষেত্রে উনি ছিলেন খুবই বিচক্ষণ। শুধু আমরা নই, ওঁর ছোট ছেলে ঋষি সাহাবও (কাপুর) বাবাকে একইরকম ভয় পেতেন। ছেলের প্রতি একই রকম কঠোর ছিলেন রাজ কাপুর। সেটে কাউকে আলাদা চোখে দেখতেন না। ওঁর কাছে সবাই ছিলেন সমান। ঋষি কাপুর সেই সময় খুবই ডিসিপ্লিনড ছিলেন। উনি বাবাকে খুবই সম্মান

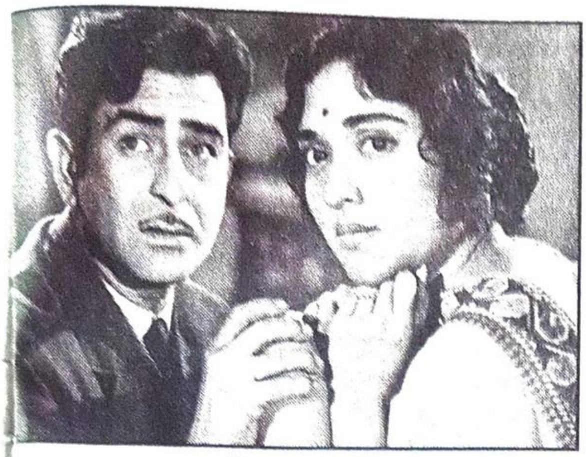

করতেন। ঋষি সাহাব ছেলে হয়েও মনে করতেন যে, একজন বড় চিত্র নির্মাতার সঙ্গে কাজের সুযোগ পেয়েছেন এবং সেইজন্য উনি কৃতজ্ঞ।

একবার একটা ভুলের মাশুল দিতে হয়েছিল আমাকে। একটা ভুল করেছিলাম বলে রাজ কাপুর মুম্বই থেকে মাইসোর যাওয়ার সময় আমাকে ওঁর সঙ্গে বিমানে নেননি। শাস্তিস্বরূপ আমাকে অন্য সহযোগী ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সঙ্গে জিপে করে মাইসোর যেতে হয়েছিল। তিন দিন লেগে গিয়েছিল আমাদের মাইসোর পৌঁছতে।

কাপুর সাহাব আপাদমস্তক ভোজনরসিক ছিলেন। শুধু নিজে খেতে ভালোবাসতেন তা নয়, সকলকে খাওয়াতেও ভালোবাসতেন। 'প্রেম রোগ' ছবির সেটে রোজ এলাহি খাবারের আয়োজন থাকত। আমরা সবাই একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া করতাম। শ্যুটিংয়ের মাঝে এক-দেড় ঘণ্টার বিরতি দিতেন। তারপর আবার শ্যুটিং শুরু হতো। 'প্রেম রোগ' ছবির শ্যুটিং শেষ হওয়ার পর আমি সুযোগ পেলেই কাপুর সাহাবের সঙ্গে দেখা করতে চলে যেতাম। ওঁর সঙ্গে যখন দেখা হতো, উনি আমার মাথায় হাত রাখতেন। ওঁর এই স্নেহের স্পর্শ আমার কাছে অনেক বড় আশীর্বাদ। আক্ষেপ একটাই যে, আমার পরিচালিত কোনও ছবি ওঁকে দেখাতে পারিনি। এই আক্ষেপ সারা জীবন থাকবে। এবছর কাপুর সাহাবের জন্ম শতবর্ষ। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমার বিশ্বাস, এভাবে আরও অনেক একশো বছর উনি ওঁর সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন।

অনুলিখন: দেবারতি ভট্টাচার্য

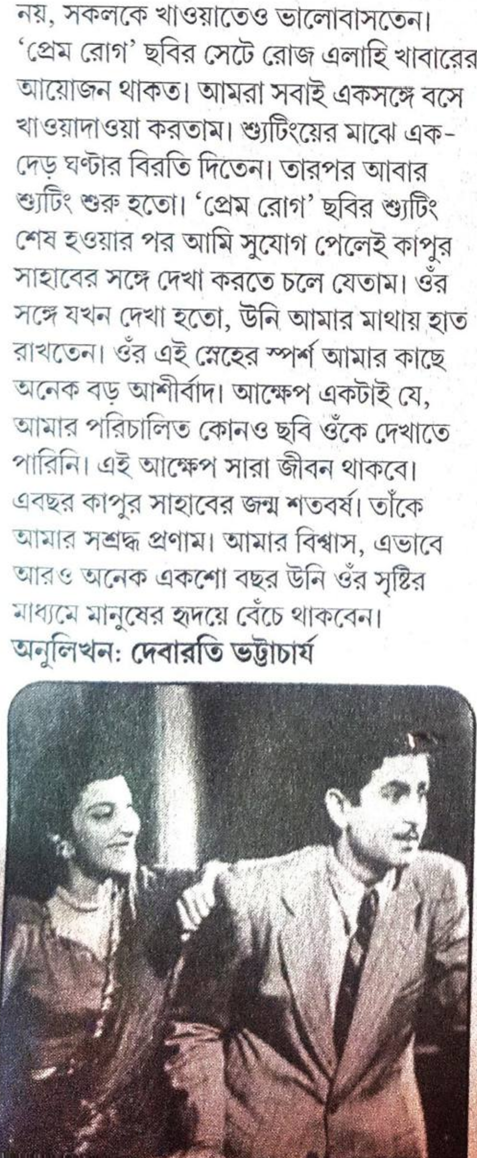

পুষ্পার অন্দরে

২০২১ সালে কোভিড তখন ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে। তারই মাঝে মুক্তি পেয়েছিল আল্লু অর্জুন অভিনীত 'পুষ্পা: দ্য রাইজ'। ছবিটি বক্স অফিসে রীতিমতো ঝড় তুলেছিল। কোভিডের কারণে দর্শক তখনও হলমুখী হতে ভয় পাচ্ছিলেন। কিন্তু 'পুষ্পা'-র টানে আবার হলে ফিরেছিলেন দর্শক। সুকুমার পরিচালিত এই ছবির হাত ধরে তেলুগু তারকা থেকে রাতারাতি প্যান ইন্ডিয়ান তারকা হয়ে উঠেছিলেন আল্লু অর্জুন। নয় থেকে নব্বই আক্রান্ত হয়েছিলেন 'পুষ্পা' জ্বরে। এদিকে 'শ্রীবল্লী' রূপী রশ্মিকা মন্দানা এই ছবির হাত ধরে 'ন্যাশনাল ক্রাশে' পরিণত হন। 'পুষ্পা' ছবিটি বক্স অফিসের অনেক হিসেবনিকেশ উল্টেপাল্টে দিয়েছিল। তারপর থেকে 'পুষ্পা ২' ছবি ঘিরে শুরু হয়ে গিয়েছিল অপেক্ষার পালা। 'পুষ্পা ২: দ্য রুল' ছবিটিকে আরও বড় আকারে আনতে মরিয়া ছিলেন পরিচালক সুকুমার। কারণ এই ছবি ঘিরে সকলের প্রত্যাশা তুঙ্গে। প্রায় তিন বছর পর সুকুমার বড়পর্দায় নিয়ে এসেছেন ৫০০ কোটির 'পুষ্পা ২'-কে।

গত পাঁচ বছর ধরে 'পুষ্পা' ঘিরেই জীবন আবর্তিত হয়েছিল দক্ষিণী তারকা আল্লু অর্জুনের। মুম্বইয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বলেন তিনি। এদিনের আসরে আল্লু এই ছবি ঘিরে তাঁর দীর্ঘ সফরের টুকরো টুকরো স্মৃতি মেলে ধরেন। তিনি সবার আগে এই সাফল্যের সিংহভাগ কৃতিত্ব দিয়েছেন পরিচালক সুকুমারকে। একটু আবেগপ্রবণ হয়ে আল্লু অর্জুন বলেন, 'পুষ্পার এই সাফল্যের আসল কারিগর সুকুমার গারু। পাশাপাশি গোটা টিমকে এই সাফল্যের কৃতিত্ব দিতে চাই। পুষ্পা সাইন করানোর সময় সুকুমার আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে, উনি এমন একটি ছবি বানাবেন, যা জাতীয় পুরস্কার জয়ের শামিল হবে। উনি ওঁর পরিশ্রম, একাগ্রতা দিয়ে সত্যিই তেমন একটা ছবি উপহার দিয়েছেন।'

আল্লু অর্জুন

'পুষ্পা' ছবিতে অভিনয় করে সেরা অভিনেতা হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন আল্লু অর্জুন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'গত ৬৯ বছরে কোনও তেলেগু অভিনেতা জাতীয় পুরস্কার পাননি। আমার মাথায় এটা ছিল। তবে পরিচালকের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। জাতীয় পুরস্কার জয়ের অনুভূতি-ই ছিল অন্য রকম।'

'পুষ্পা: দ্য রাইজ' ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করে জাতীয় পুরস্কার জয় করেছিলেন দেবী শ্রী প্রসাদ। এদিনের আসরে দেবী শ্রী প্রসাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্বের কথাও তুলে ধরেন অর্জুন। তিনি বলেন, 'আমি আর ডিএসপি (দেবী শ্রী প্রসাদ) দু'জনেই চেন্নাইয়ের।

আর আমরা দু'জনেই মনে করতাম যে, বলিউডে কাজ করা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। একদিন ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, ও কেন হিন্দি ছবিতে কাজ করে না? তার জবাবে ডিএসপি আমাকেও পাল্টা একই প্রশ্ন করেছিল। বলেছিলেন, হিন্দিতে কাজ করা আমার কাছে অনেক দূরের স্বপ্ন। তুমি আগে কাজ করো হিন্দিতে, তারপর আমি করব। ডিএসপির হিন্দিতে প্রথম কাজ সলমন খানের 'রেডি'। এরপর আমরা একসঙ্গে 'পুষ্পা' ছবিতে কাজ করলাম। যেটার হিন্দি ভার্সনও বিশাল হিট হল। আর মজার কথা, এই ছবির জন্য আমরা দুই বন্ধুই জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলাম।'

'পুষ্পা' ছবির নায়িকা রশ্মিকা মন্দানাকে ঘিরে প্রশংসা ঝরে পড়েছিল আল্লু অর্জুনের কণ্ঠে। বলেন, 'শ্রীবল্লীর চরিত্রটি ছাড়া পুষ্পা ফ্র্যাঞ্চাইজি অসম্পূর্ণ। গত চার বছর ধরে আমি শুধু একটা নায়িকার সঙ্গে কাজ করছি, আর সে হল রশ্মিকা। আমরা অনেকটা পরিবারের মতো হয়ে গিয়েছি। আমি ওর সঙ্গে খুব স্বচ্ছন্দ্য। 'শ্রীবল্লী'র সাপোর্ট ছাড়া এই ছবিটা সম্পূর্ণ হতো না। আমার প্রায় প্রতিদিনই শ্যুটিং থাকত। আর ও কখনও সখনও সেটে আসত। কিন্তু যেদিন রশ্মিকা সেটে আসত, সেদিন দারুণ মজা করতাম। ও পজেটিভ এনার্জিতে ভরপুর।'

'পুষ্পা রাজ' মানেই এক গাল দাড়ি। এক সময়ে এই দাড়ির কাটতে মরিয়া হয়ে গিয়েছিলেন বলে জানালেন এই দক্ষিণী হিরো। তিনি হেসে বলেন, 'গত পাঁচ বছর ধরে আমি পুষ্পার জন্য কাজ করছি। আমি শুধু শ্যুটিং শেষ হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। চরিত্রের প্রয়োজনে দাড়ি রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমি ক্লিন-সেভ পছন্দ করি। আমার মেয়ে আরহার বয়স এখন আট। আসলে এই দাড়ির জন্য ওকে চুমু খেতে পারতাম না।'

ছবির অন্দরের গল্প প্রসঙ্গে রশ্মিকা বলেন, 'প্রথম দিনের শ্যুটিংয়েই আল্লু অর্জুনের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কথা ছিল। তাই ভীষণ নার্ভাস ছিলাম। ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে, আমার কী করণীয়। আসলে তখনই ও দক্ষিণের বড় স্টার। তাই ওকে কী বলব, কীভাবে একসঙ্গে কাজ করব, তা নিয়ে চাপা টেনশন ছিল। কিন্তু কাজ করতে করতে সম্পর্কটা সহজ হয়ে যায়। এখন আমরা একই পরিবারের সদস্যের মতো।'

দেবারতি ভট্টাচার্য

রশ্মিকা

আনন্দীর ফ্লোরে আদর্শের আনন্দগান

আনন্দীকে ঘিরে নানান ফন্দি! একদা ঠাম্মির অ্যাটেন্ডেন্ট হয়ে আসা। ঘটনাচক্রে পরবর্তীকালে লাহিড়ীবাড়ির ছেলের বউয়ের মর্যাদা পাওয়া! মেয়েটিকে পদে পদে হেনস্তা করার জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নেমে পড়েছে নন্দিনী, সুপায়ন, আদির কাকিমা চৈতি। আনন্দীর বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ, সে নাকি লাহিড়ীবাড়ির দেড়শো বছরের পুরনো দুর্গা মূর্তির সাতনরি সোনার হার চুরি করেছে। আনন্দীও আপস করার মেয়ে নয়। পাল্টা তদন্তে সেও নেমেছে শ্বশুরবাড়ির সবাইকে সন্দেহের তালিকায় রেখে। আবিষ্কার হয়, চোর আর কেউ নয়, যে সবচেয়ে বেশি চেঁচামেচি করছিল, সেই চৈতিই চুরি করেছে হারটা। এহেন টেনশনের মধ্যেই সেদিন এনটিওয়ান

ঋত্বিক ও অন্বেষা

স্টুডিওতে ‘আনন্দী’র সেটে পা রাখা। টিআরপির টাগ অব ওয়ারে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই উপরের দিকে থাকা জি বাংলার জনপ্রিয় ধারাবাহিকটির শ্যুটিং ফ্লোরে অবশ্য কোনও উত্তেজনা নেই। আশ্চর্য! পরবর্তী শট শুরু হওয়ার আগে দিব্যি গলা জড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে আনন্দী আর চৈতি। অফ স্ক্রিন এই গলাগলি কয়েক মুহূর্ত পরে ক্যামেরার সামনে কোন রসায়নে ধুন্ধুমার দলাদলির রূপ নেয়! ‘চিত্রনাট্যের গুণে তো অবশ্যই। আমাদের কারওর মধ্যে তো আর ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। একটা মেগা শুরু হলে ফ্লোর, মেকআপ রুম সবটাই আমাদের সংসারের অঙ্গ হয়ে যায়। শ্যুটিং তো হয় চোদ্দো ঘণ্টা। স্টুডিওতে আসা-যাওয়া সব মিলিয়ে ষোলো আঠারো ঘণ্টা থাকতে হয় আমাদের। শটের আগে-পরে তাই সবাই সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে যাই আমরা। বাকিটা স্রেফ অভিনয়,’ ভূমিকাহীনভাবে গড়গড় করে কথাগুলো বলে গেলেন ‘আনন্দী’ অন্বেষা হাজরা। এই রাখঢাকহীন কথা বলার কায়দার জন্য বদরাগী হিসেবে কিঞ্চিৎ বদনামও আছে বর্ধমানের মেয়েটির। সদা চঞ্চল, ছটফটে অন্বেষা অভিযোগ প্রসঙ্গে অকপট, ‘আমি আগেও যেমন ছিলাম, এখনও তেমন আছি।’ আড্ডায় এবার আগ বাড়িয়ে এন্ট্রি নিলেন আনন্দীর হিরো ঋত্বিক মুখোপাধ্যায়। ‘আমাদের এই পথ যদি না শেষ হয়’ ধারাবাহিকেও জুটি বেঁধে ছিলেন ঋত্বিক-অন্বেষা। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে ‘আনন্দী’র ডাঃ আদিদেব লাহিড়ীর পর্যবেক্ষণ, ‘অন্বেষা এখন অনেক ম্যাচিওরড।’ নায়ককে থামিয়ে নায়িকার নীতিকথা, ‘ঋত্বিকদা বলছে বটে আমার রাগ নাকি এখন কমে গিয়েছে, কিন্তু রাগ কমে না, নিয়ন্ত্রণটা রপ্ত করতে হয়। সেই অভ্যাসটা তৈরি করছি বলতে পারেন। ভেতরে ভেতরে আমি আগের অন্বেষাই আছি।’ কিন্তু অন্বেষার উন্নতিটাও তো লক্ষ করার মতো! প্রশ্নটা লুফে নিয়ে অন্বেষার প্রতিক্রিয়া, ‘বুঝেছি, সিনেমা করার কথা বলছেন তো? মানসীদির (সিনহা) ৫ নম্বর স্বপ্নময় লেন আসছে। আমি ওই ছবিতে ছোট একটি চরিত্রে অভিনয় করেছি। এর আগেও আমি কিন্তু ছবিতে অভিনয় করেছি— ‘তুমি ও তুমি’ আর ‘চিনি ২’। চিনি ২-এ আমি একটা ক্যামিও রোলে অভিনয় করেছি। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে বৃত্তটা বড় হচ্ছে বটে, কিন্তু মেগা অনেক কিছু শেখায়, রোজের চ্যালেঞ্জ।’

‘৫ নম্বর স্বপ্নময় লেন’-এর কাজের জন্য ‘আনন্দী’র সম্প্রচার দেড় মাস পিছিয়ে দেওয়ায় জি বাংলার কাছে কৃতজ্ঞ অন্বেষা। প্রাপ্তির ভাঁড়ার ঋত্বিকেরও কি পূর্ণ নয়? প্রশ্নের ইঙ্গিতে লাজুক হাসেন অভিনেতা। সম্প্রতি চুপিসারে দীর্ঘদিনের প্রেমিকা দিশার সঙ্গে আইনি বিয়েটা সেরে ফেলেছেন ঋত্বিক। গোপন বিবাহ অভিযানের মতোই আড়ালে রাখতে চান তাঁদের সদ্য, নতুন, আনকোরা দাম্পত্যের দৈনন্দিনতা। বরং ডাঃ আদিদেবকে নিয়েই বেশি স্বচ্ছন্দ ঋত্বিক। চরিত্রটার সঙ্গে অভিনেতার ব্যক্তিজীবনে অনেকটা মিল আছে বলেই

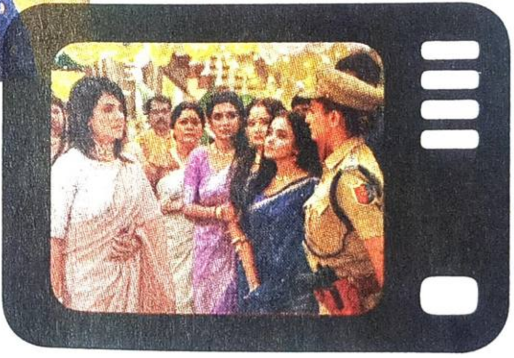

আনন্দীর শ্যুটিংয়ের দৃশ্য

কি? কয়েক সেকেন্ড ভেবে বললেন, ‘হ্যাঁ, আদর্শবোধের জায়গা থেকে কিছুটা মিল অবশ্যই আছে। তবে এটা কোনও বিরাট ব্যাপার নয়। মানুষ মাত্রই এই আইডিওলজিটা থাকা উচিত। থাকেও। এই দায়িত্ব, কর্তব্যের বোধগুলো আছে বলেই তো আমরা মানুষ।’

সেই দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থেকেই কি দীর্ঘদিনের প্রেমকে নীরবে স্বামী-স্ত্রীর মর্যাদায় মান্যতা দেওয়া? প্রশ্ন শুনে মুচকি হেসে ফের পরের শটে মন দিলেন ঋত্বিক।

প্রিয়ব্রত দত্ত

মেষ রাশি: সপ্তাহটিতে কাজকর্মের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হবে। তবে গয়ংগচ্ছ মনোভাবের জন্য সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি। শরীর স্বাস্থ্যের সমস্যা মানসিক দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমতার অভাব।

শুভদিন: ১৮, ১৯, ২০

বৃষ রাশি: কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি। গৃহ সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের প্রচেষ্টা সফল হবে। ঋতু পরিবর্তনের কারণে রোগভোগের আশঙ্কা। বিদ্যায় ক্রমোন্নতি। ধর্মকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণে মানসিক শান্তি লাভ। সন্তানের শিক্ষার উন্নতি ও আনন্দ লাভ।

শুভদিন: ১৪, ১৫, ১৬

মিথুন রাশি: গৃহ বা কর্মক্ষেত্রে আচরণ মার্জিত না করলে বিড়ম্বনায় পড়তে পারেন। ব্যবসা কমবেশি শুভ হবে। নিকট আত্মীয়ের জন্য আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা। সমাজসেবী ও রাজনীতিকদের পক্ষে সপ্তাহটি বিশেষ শুভ নয়। স্বাস্থ্যহানি ও আঘাত যোগ থাকায় সতর্ক হন।

শুভদিন: ১৫, ১৬, ১৭

কর্কট রাশি: ভূসম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে আইনি বিষয়গুলি বিশেষজ্ঞের দ্বারা দেখে নিন। কাজকর্মের ক্ষেত্রে বাধা কমবে, ব্যবসা ভালো হবে। তবে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সতর্ক হন। বাত ও জ্বর সর্দি কাশিতে ভুগতে হতে পারে। কুচক্রীদের চক্রান্তে পারিবারিক ক্ষেত্রে অশান্তির যোগ আছে। মানসিক হতাশা ও অস্থিরতা কমাবাড়া করবে।

শুভদিন: ১৭, ১৮, ১৯

সিংহ রাশি: উপস্থিত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার জোরে সাফল্য। স্বার্থান্বেষী শত্রুরা কর্মে বাধার চেষ্টায় বিফল হবে। অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে শুভ, গবেষণায় উন্নতি। মানসিক উদাসীনতা ত্যাগ করে কর্মে মনোনিবেশ করুন। দাম্পত্য, সন্তান, অর্থ ক্ষেত্রগুলি ভালো থাকবে।

শুভদিন: ১৮, ১৯, ২০

তুলা রাশি: সপ্তাহটি অপেক্ষাকৃত শুভ। কর্মপরিকল্পনায় চমৎকৃত সাফল্য পেতে পারেন। কারও কাছ থেকে মূল্যবান দ্রব্য উপহার প্রাপ্তিও অসম্ভব নয়। পারিবারিক ক্ষেত্রটি কমবেশি ভালো থাকবে। শরীর স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো নাও যেতে পারে। আর্থিক দিকটি শুভ। মানসিক অস্থিরতার জন্য কর্মে বাধা।

শুভদিন: ১৫, ১৬, ১৭

সপ্তাহের প্রারম্ভে রাশিচক্রে গ্রহাবস্থান: বৃশ্চিক রাশিতে রবি ও বক্রী বুধ, বৃষরাশিতে চন্দ্র ও বক্রী বৃহস্পতি, মকরে শুক্র কর্কটে বক্রী মঙ্গল, কুম্ভে শনি, মীনে রাহু আর কন্যায় কেতু। চলতি সপ্তাহে রবি ধনু রাশিতে প্রবেশ করবেন।

১৪ ডিসেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর

ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কন্যা রাশি: কর্ম পরিবেশের জটিলতা ক্রমশ কাটবে ও কাজকর্মে উন্নতি হবে। সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ করায় গুরুত্বপূর্ণ কর্মে সাফল্য। সৃজনশীল কর্মে স্বীকৃতি পাবেন। বাণিজ্যশাস্ত্রের অধ্যয়নে বিশেষ শুভ। স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রটি মোটামুটি। তবে, মানসিক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা আসতে পারে।

শুভদিন: ১৪, ১৫, ১৬

বৃশ্চিক রাশি: পারিবারিক ক্ষেত্রে আপনার কাছে উপকৃত বিশেষ কোনও প্রিয়জনের ব্যবহার ও বাক্যে মানসিক আঘাত পেতে পারেন। যেকোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক হন। রক্তপাত যোগ থাকায় সতর্ক হন। দাম্পত্য ক্ষেত্রে চাপ থাকলেও বড় কোনও ঝামেলা- ঝঞ্ঝাট হবে না। ভূ-সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ আসতে পারে।

শুভদিন: ১৭, ১৮, ১৯

ধনু রাশি: সম্পত্তি বা জমিবাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাড়তি কিছু লাভ পেতে পারেন। অর্থ ও তর্কশাস্ত্র অধ্যয়নে শুভ। কাজকর্মের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও সাফল্যের সম্ভাবনা। ধর্মকর্মে মন আকৃষ্ট হবে ও দৈব কৃপালাভও হতে পারে। অর্থ ভাগ্য কমবেশি শুভ।

শুভদিন: ১৮, ১৯, ২০

মকর রাশি: কারও কথায় অর্থ বিনিয়োগে ক্ষতির আশঙ্কা। কাজকর্ম কমবেশি এগবে। তবে প্রত্যাশিত গতির অভাব থাকবে। অর্থকরী ক্ষেত্রটি বিশেষ শুভ নয়। উচ্চাশা পূর্ণ না হওয়ায় হতাশা। পারিবারিক ক্ষেত্রটি মোটামুটি থাকবে। গুরুজনের ও নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা।

শুভদিন: ১৪, ১৫, ১৬

কুম্ভ রাশি: কাজকর্মে বাধা থাকবে। রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবসায়ে মন্দা আসতে পারে। আচরণে সংযত না হলে অপদস্থ হতে পারেন। জ্ঞাতিরা সম্পত্তি গ্রাসের চেষ্টা করতে পারে। অর্থকরী ক্ষেত্রটি বিশেষ অনুকূল নয়। কর্মস্থলে শত্রু বাড়বে। মন অস্থির হতে পারে। শরীরের সমস্যা ও আঘাত যোগ প্রবল।

শুভদিন: ১৫, ১৬, ১৭

মীন রাশি: মানসিক অস্থিরতা, বিক্ষিপ্ত মনোভাব ও ভবিষ্যৎ চিন্তা বাড়তে পারে। বিদ্যালাভে মনোযোগের অভাব। কাজকর্ম কমবেশি এগবে। অর্থভাগ্য শুভ। প্রেম ও প্রণয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির সামনে পড়তে হতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যার যোগ। ব্যবসায়ীদের আর্থিক ও ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি।

শুভদিন: ১৭, ১৮, ১৯

Like us on facebook.com/www.cookme.in
STREET FOOD
এখন বাড়িতেই
পরিচ্ছন্নতার চিন্তা gone!
স্ট্রীট ফুডের মজা এখন বাড়িতেই।
শুধু মেশান, মাখুন আর রাঁধুন
Cookme
Spicemakers since 1846
Ready to Cook for Tarka
Ready to Cook for Chowmein
Ready to Cook for Pav Bhaji
Chat
Mixture of spices
Enhanced Taste & Flavour
Ready to Cook for Chana
Mixture of spices